আদর্শ-দম্পতি

(গার্হস্থ্য উপন্যাস)

শ্রীমন্মথকুমার রায়, বি, এল।

শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার প্রকাশিত
১০।২এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৫ সাল

এ, চৌধুরী
কিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২১নং কালিদাস সিংহ লেন,
কলিকাতা

আদর্শ দম্পতি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"পতি পত্নী যে সংসারে
এক প্রাণ হয়।
কোথা তথা দুঃখ ভীতি
দুর্ভাবনা রয় ?"

"ছি এত হতাশ হ'য়ো না, এত চিন্তা করো না, সর্ব্বদা এরূপ ভাবনা করতে করতেই তোমার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে ; চিন্তা করে কি কিছু লাভ আছে ? ভগবান্ ভরসা, তিনি দয়াময়, তাঁহার কৃপায় এ দিন কেটে যাবে, সুদিন আসবে। চিরকাল কি কখনো এক ভাবে দিন যায় ?"

সুনীতি রুগ্ন স্বামী রমেশচন্দ্রের মাথায় গোলাপ জল মিশ্রিত সুশীতল জল সিঞ্চন করিতে করিতে সাংসারিক আয় ব্যয় সম্বন্ধে চিন্তাকুল স্বামীকে এই সান্ত্বনা বাক্য বলিলেন। রমেশচন্দ্র আজ দুই দিন যাবৎ শিরঃপীড়ায় বড় কষ্ট পাইতেছেন—সর্ব্বদা মাথা ঘুরে, বালিস হইতে মস্তক উত্তোলন করিলেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন চক্রাকারে ঘুরিতেছে, এইরূপ বোধ হয়। বায়ু বৃদ্ধি হইয়া এইরূপ হইয়াছে, মূলবিশ্বাসে বিশেষ কোন ডাক্তার কবিরাজের সাহায্য

গ্রহণ করা হয় নাই; প্রাচীন জনৈক প্রতিবেশীর পরামর্শ মতে মাথায়, কপালে, কানের দুই পার্শ্বে ঠাণ্ডা জলের সেঁক দিয়া নিরন্তর বাতাস দেওয়া হইতেছে। প্রাচীন লোকটি বলিয়াছেন, গরমে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া এইরূপ অনেকেরই অনেক সময়ে হইয়া থাকে, ইহা বিশেষ এমন কিছু ভয়ের পীড়া নহে, এইরূপ ভাবে শুশ্রূষা করিলেই, সারিয়া যাইবে। সুনীতি তদনুসারে রমেশ-চন্দ্রের মাথায় ও কপালে জল দিতেছেন ও ঘন ঘন একখানা তালপত্রের পাখা সঞ্চালন করিয়া বাতাস দিতেছেন। ইহা ডাক্তারের বিজ্ঞান সঙ্গত অথবা কবিরাজের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের বিধিসম্মত ব্যবস্থা কিনা, এবং তাঁহারা, তাঁহাদের চিকিৎসাধীন হইলে, এই অবস্থায় এরূপ ব্যবস্থা করিতেন কিনা, তাঁহারাই বলিতে পারেন,—আমরা সে বিষয় বলিতে পারি না; তবে সুনীতি এইরূপ করিয়াছিলেন, এবং সুনীতি যেরূপ করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই বলিতেছি।

সুনীতির কথায় রমেশচন্দ্র প্রেমাকুল নয়নে অতি ধীর দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের প্রতি চাহিলেন এবং অধরপ্রান্তে একটু ঈষৎ প্রকাশ হাসি লইয়া সুনীতির কর ধারণ করিয়া বলিলেন—

"ভগবান্ ভরসা? সুনীতি, আমার ভরসা ভগবান্ নন, আমার ভরসা তুমি। তোমার ন্যায় আমার ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস কি নির্ভরতা নাই—আমি তাঁহাকে ধরে সংসার সমুদ্রে ভাসতে শিখি নাই, তা পারিও না। তোমার আছে, আমি তোমাকে ধ'রে থাকবো; তুমি আমাকে ভাসিয়ে রেখেছ, নতুবা বোধ হয় এতদিনে এই অকূল সাগরের কোন অতল জলে ডুবে যেতাম। সুনীতি, তুমি দেবী—তুমি রমণী নহ!

সুনীতি আর অধিক বলিতে দিলেন না ;—তাড়াতাড়ি স্বামীর অধরোপরে আপনার কমনীয় সুখস্পর্শ অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া কহিলেন—

"ছিঃ, এ আবার কি কথা! আমি তোমার দাসী—তোমার আশ্রিতা। তুমি আমার জীবন-সর্ব্বস্ব, হৃদয়-দেবতা—কত জন্মের তপস্যার ফলে আমি তোমার চরণে স্থান পেয়েছি।"

"এ কথা তোমারই উপযুক্ত বটে। সাধ্বী স্ত্রীর এই দাসীত্বেই রাণীত্ব। সে থাক, সুনীতি, যা ভাবছিলাম—

"আবার ভাবনা! না, না, আমার মাথা খাও, আর ভাবনা করো না, যা হবার হবে, ঈশ্বর যা করবার করবেন; তুমি আর চিন্তা করতে পাবে না। তুমি আমার থাকলে, সব আছে, সব হবে।"

বলিয়া আবেগ ভরে সুনীতি রমেশচন্দ্রের বক্ষের উপর কোমল ভাবে হেলিয়া পড়িয়া অধরে অধর চাপিয়া ধরিলেন—আর বলিতে দিলেন না।

প্রেমময়ীর প্রেমস্পর্শে রমেশচন্দ্রের চিন্তা ভাবনা সব ক্ষণেকের জন্য দূর হইয়া গেল; তিনি অনির্ব্বচনীয় স্বর্গসুখে নিমজ্জিত হইলেন; প্রতি-প্রেমোচ্ছ্বাসে দুই বাহু প্রসারিত করিয়া প্রিয়তমা পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন এবং ঘন ঘন তাহার গোলাপ বিনিন্দিত গণ্ডে চুম্বন দিয়া বলিতে লাগিলেন—

"সুনীতি, প্রাণেশ্বরি, তোমার মাথা খাব? তোমার মাথা? তোমার মাথা যে আমার জীবনের অধিক আদরের—স্বর্গের সম্পদ অধিক আকাঙ্খার—না, না, আমি আর ভাবনা করবো না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"পতি-পত্নী পরস্পরে, সুখ দুঃখ ভাগ
লয় যদি ; বাড়ে ক্রমে প্রীতি অনুরাগ।"

তারপর দুই দিন গিয়াছে।" আজ রমেশচন্দ্র অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। প্রাতঃকালে মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া রমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে আপনার বৈঠকখানায় গেলেন। এই তিন দিন পর্য্যন্ত তিনি বৈঠকখানায় একবারও আসিতে পারেন নাই। বৈঠক-খানায় একদিকে এক প্রশস্ত ফরাসের ন্যায় একটি বিস্তৃত বিছানায় দুটি ব্যক্তি দুটী ছোট কাঠের বাক্স সম্মুখে করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। এই ব্যক্তিদ্বয় ব্যতীত আর অপর লোক একটিও ছিল-না। রমেশচন্দ্র অন্য লোক দেখিতে না পাইয়া কতকটা ক্ষুণ্ণভাবে আপনার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিলেন ; এবং কিছু অপ্রসন্ন বদনে কথিত ব্যক্তিদ্বয়কে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ কোন মোকর্দ্দমা আছে ? দেখি ডায়েরি খানা।"

রমেশচন্দ্র উকীল। কমিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আজ প্রায় চারি বৎসর হইল ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন। একে নূতন উকীল, তাহাতে আবার সহায় সম্পদ এমন বিশেষ কিছু নাই ; গতিকেই, সৎ, বুদ্ধিমান ও শ্রমশীল হইয়াও রমেশচন্দ্র এ যাবৎ কিছুই পসার করিতে পারেন নাই—এমনকি ব্যবসায়ের আয় হইতে রীতিমত সংসার চালাইতেও পারিতেছেন না।

যে দুই জন ব্যক্তি প্রশস্ত বিছানায় বসিয়া রহিয়াছে, তাহারা রমেশচন্দ্রের মুহুরী ; একজন হিন্দু, অপরটি মুসলমান। অনেকে

হয়তো মক্কেল করিতেছেন যাহার কিছুমাত্র পসার হয় নাই, তাহার আবার দুই জন মুহুরী কেন? এইরূপ মনে করা অস্বাভাবিক নহে; তবে কথা এই যে—বঙ্গদেশের বহু স্থানেই উকীলগণ প্রথম অবস্থায়, বিশেষ যাহাদের নিজ এলাকা নয় অথবা কোন মুরুব্বি নাই, তাহারা স্থানীয় লোক মুহুরীস্বরূপ নিযুক্ত করিয়া তাহাদের পরিচয় ও প্রতিপত্তিতে দুই চারিটী মক্কেল পাইবার আশা করেন। রমেশচন্দ্রের বাড়ী ঢাকা বিক্রমপুর, কুমিল্লা জেলান্তর্গত চাঁদপুর মহকুমায় ওকালতি করিতে বসিয়াছেন; কাজেই এই স্থান তাঁহার নিজ এলাকার মধ্যে নহে, নিজের প্রতিপত্তিও এখানে কিছু নাই, তারপর তাহাকে সাহায্য করে এমন লোকও কেহ নাই; সুতরাং সাধারণ গৃহীত পথ অনুসারে মুহুরীর সাহায্যে মামলা মোকর্দ্দমা পাইবার আশায় রমেশচন্দ্র দুইজন মুহুরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দেশে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি প্রধানতঃ বাস করে; কাজেই দুই জাতি হইতে দু'টি লোক রাখিলেন। হিন্দুটী কিছু লেখা পড়া জানে, মুহুরীর কাজও একরকম শিখিয়াছে; কিন্তু মুসলমানটি প্রায় একেবারে গো-অক্ষর, বিদ্যা বোধ হয় বর্ণপরিচয় অতিক্রম করিয়াছিল না, তবে তাহার মামলা মোকর্দ্দমাকারী অনেক আত্মীয় কুটুম্ব আছে। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই অধিক এবং তাহাদের মধ্যেই মোকর্দ্দমা বেশী। হিন্দু মুহুরীটির পরিচয়ে অধিক মোকর্দ্দমা পাইবার আশা না থাকিলেও সে কাজ কর্ম্মে পাকা, তাহার দ্বারা মোকর্দ্দমার কাগজ পত্র লেখাপড়া ও মামলার তদ্বির করা প্রভৃতি কার্য্য সকল চলিবে, এই ভাবিয়া রমেশচন্দ্র তাহাকে রাখিয়াছিলেন, এবং মুসলমানটির

সাহায্যে মামলা মোকর্দ্দমা পাইবেন, এই ভরসায় তাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

হরিচরণ অর্থাৎ হিন্দু মুহুরী রমেশচন্দ্রের বাসায়ই আহার করে, আর মহম্মদ হোসেন অর্থাৎ মুসলমান মুহুরী, এক হোটেলে খায়, তাহাকে মাস মাস ৫৲ টাকা করিয়া খোরাক বাবদ দিতে হয়!

রমেশচন্দ্রের কথায় হরিচরণ যেন কিছু লজ্জিত ও শঙ্কিত হইল এইরূপ ভাবে অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্যে বলিল—"আজ্ঞে, না বাবু, আজ কোন মোকর্দ্দমা নাই।" এই বলিয়া ডায়েরীখানা রমেশচন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর স্থাপন করিল।

রমেশচন্দ্র ক্ষোভে ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিন্তু আর কোনও কথা কহিলেন না;—ডায়েরীখানার পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ডায়েরীর প্রায় সকল পৃষ্ঠাই খালি, কেবল মাঝে মাঝে দুই এক পৃষ্ঠায় দুই একটি মোকর্দ্দমার তারিখ লেখা আছে। রমেশচন্দ্র ডায়েরীর এই অবস্থা দেখিয়া নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন;— যে ভাবনা-রাশি পত্নীর বাক্যে হৃদয় হইতে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন সেই ভাবনা-সাগরে আবার নিমগ্ন হইলেন।

কি করিয়া সংসার চলিবে, কি উপায় হইবে, হায় তিন চারি বৎসর চলিয়া গেল, ব্যবসায়ে কিছু সুবিধা করিতে পারিলাম না, সংসারের খরচ চালাইতে পারিতেছি না, এক এক করিয়া আশায় আশায় সুনীতির গহনা কয়খানা প্রায় সব বন্ধক দিয়া ফেলিয়াছি, কি করিয়া তাহা উদ্ধার করিব, এইরূপ বিবিধ চিন্তা করিতে করিতে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন;—অস্থির বোধ করিতে লাগিলেন, আর সেখানে বসিতে পারিলেন না, রাস্তার দিকে একবার হতাশ নয়নে চাহিয়া, চঞ্চল পদে উঠিয়া বাড়ীর মধ্যে

গেলেন এবং একেবারে শয্যায় যাইয়া শয়ন করিয়া পড়িলেন। সুনীতি রান্নার আয়োজন করিতেছিলেন—তিনি নিজেই রান্না হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের সমস্ত কাজ করেন, তাহাতে তাঁহার কিছুমাত্র বিরক্তি বা ঘৃণা নাই কেবল একজন ঠিকা চাকর সকালে বৈকালে আসিয়া ঘর দুয়ার লেপিয়া পুঁছিয়া, বাসনাদি ধুইয়া ও পান ব্যবহারের জল তুলিয়া দিয়া যায়। তিনি উনানে ভাত চাপাইয়া মাছ তরকারি কুটিয়া 'বাটনা' বাটিতেছিলেন, এমন সময় রমেশচন্দ্রকে ঐ অবস্থায় আসিয়া শয্যায় পড়িতে দেখিলেন। পতিব্রতার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার আশঙ্কা হইল আবার বুঝি স্বামীর পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই ক্ষিপ্রহস্তে শিলাস্থিত মসলাদি একটি বাটি দ্বারা ঢাকিয়া দ্রুতগতি শয়ন ঘরে স্বামীর পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন এবং নিতান্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, আবার অসুখ বোধ হচ্ছে নাকি ?"

রমেশচন্দ্র সুনীতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"অসুখ, সুনীতি ? আমার আবার সুখ কোথায় ? সুনীতি, আমি অভাগা, আমার কপালে সুখ নাই ; আমার অদৃষ্টের দোষে যে তুমিও দুঃখ পাচ্ছ, তাই আমি চিন্তা করে অস্থির হয়েছি।'

বুদ্ধিমতী সুনীতির বুঝিতে বাকি রহিল না—সহসা এমন চিন্তা-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইবার কারণ কি ? বৈঠকখানায় কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা তিনি সবই শুনিয়াছিলেন ;— ছোট বাড়া' মাত্র তিন খানা ঘর, বৈঠকখানা, শয়নগৃহ ও পাকগৃহ ; ঘর কয়খানা অদূরবর্ত্তী, প্রায় পরস্পর সংলগ্ন। কাজেই, কাজের অভাব, মক্কেল নাই, কি করিয়া সংসার খরচের সংস্থান হইবে, এই সব চিন্তা করিয়া যে স্বামী হতাশ হইয়া এইভাবে আ সয়া

পড়িয়াছেন, তাহা ক্ষণ মাত্রেই সুনীতি বুঝিলেন। পতিপরায়ণা পত্নীর, পতির মর্ম্মবেদনা উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হয় না; কারণ তাঁহার অন্তর সর্ব্বদা পতির অন্তরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। তাহার চিন্তা নিরন্তর পতির ধ্যানে ও পতির মঙ্গল কামনায় নিমগ্ন থাকে। পতিব্রতা নারী যে শুধু পতির বেদনা উপলব্ধি করে' তাহা নহে; সেই বেদনার কণিকাও যদি নিজের প্রাণ সমর্পণে উপশমিত করিতে পারে, তজ্জন্য প্রস্তুত থাকে!

সুনীতি রমেশচন্দ্রের ক্ষোভের হেতু বুঝিলেন—আরও বুঝিলেন, সংসারের যে অবস্থা তাহাতে এ ক্ষোভ অমূলক নহে এবং তাহা নিবারণের উপায় নাই, তথাপি তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু উপশম করা সম্ভব, তাহা তিনি করিবেন। তিনি জানেন অথবা মনে প্রাণে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন (এই সরল বিশ্বাসই, এই জ্ঞানই পতিরতা রমণীর সার সুখ, পরম শান্তি) যে তিনি যেমন রমেশচন্দ্রের ভালবাসায় মুগ্ধ, রমেশচন্দ্রও তাঁহার ভালবাসায় সেইরূপ মুগ্ধ ও ভরপূর; তিনি যেমন সংসারের সহস্র দুঃখ, সহস্র অভাবের মধ্যে রমেশচন্দ্রের মুখ দেখিয়া সব ভুলিয়া যান, স্বর্গসুখে ভাসমান হন, রমেশচন্দ্রও তাঁহার অনন্ত চিন্তা যন্ত্রণার মধ্যে হা হুতাশ অন্ধকারের মধ্যে, তাহার স্নেহস্পর্শে, তাহার প্রেম-সুধা পানে বিপুল শান্তি লাভ করিয়া থাকেন এবং অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত চিন্তার জ্বালায় মুক্ত হন। তাই সুনীতি স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে রমেশচন্দ্রের কণ্ঠ বাহু-বেষ্টনে আবৃত করিয়া তাঁহার ললাটে আপন কপোল স্থাপিত করিয়া ধীর কোমল স্বরে বলিলেন— ছি, আবার চিন্তা! এই বুঝি তোমার ভালবাসা, এই বুঝি আমাকে স্নেহ কর? আমার না মাথার দিব্য ছিল?

প্রেমিকার প্রেম আলিঙ্গনে প্রেমিক মজিয়া গেল; রমেশচন্দ্র কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা ভাবনা ভুলিয়া গিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। প্রকৃতই সুনীতির সুখসঙ্গে রমেশচন্দ্রের অপার শান্তি উপস্থিত হয়— তাহার হৃদয় গগনে সমস্ত ঝড়ঝটিকা দূর হইয়া নির্ম্মল জ্যোৎস্নার বিকাশ হয়। সুনীতির যে বিশ্বাস ছিল তাহা মিথ্যা নহে। বস্তুতঃ পক্ষেই সুনীতি যেরূপ রমেশচন্দ্রের হৃদয়ভরা একনিষ্ঠ ভালবাসায় মুগ্ধা ও বিহ্বলা, রমেশচন্দ্রও তদ্রূপ সুনীতির নির্ম্মল পবিত্র প্রাণঢালা ভালবাসায় মুগ্ধ ও বিহ্বল। তাঁহারা আর কিছু চাহেন না, তাঁহারা উভয় উভয়কে লইয়াই শুধু থাকিতে চা'ন। কিন্তু এই পোড়া সংসারে, এই 'অন্নগত প্রাণা'র জগতে কি তাহা পারা যায়? অন্নের চিন্তায়, জঠরের জ্বালায়, সেই প্রণয় মধুর স্বর্গীয় জীবনেও তুফান উপস্থিত হয়, অন্ধকার আসিয়া পুঞ্জীভূত হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

"দাম্পত্য প্রণয় পবিত্র মধুর
স্বার্থ শূন্য তায় যদি
আর কিরে আছে মানব জীবনে
ইহা হ'তে সুখ-নিধি।"

রমেশচন্দ্র কতক্ষণ প্রণয়িনীকে বক্ষে ধরিয়া সুখ-সাগরে ভাসিলেন; তারপর ধীরে ধীরে আদরে সুনীতিকে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন—

'সুনীতি, তোমার দিবা'র কথা মনে আছে, কিন্তু পারি না যে, চিন্তার উচ্ছ্বাস দমন ক'রে রাখতে পারি না যে! সুনীতি, কি উপায়ে সংসার চলবে? তিন চার বৎসর হয়ে গেল, কোনই ত' সুবিধা হচ্ছে না; আমি যে চারিদিক অন্ধকার দেখছি।"

সুনীতি স্বামীর কর ধীরে ধীরে আপন করের মধ্যে লইয়া আনত বদনে বলিলেন—"ভগবান্ আছেন। এ দিন থাকবে না, সুদিন অবশ্যই ফিরবে!"

"আর কবে ফিরবে? জীবনের অর্দ্ধেক প্রায় চ'লে গেল— সুখের মুখতো দেখতে পেলাম না। সুখের মুখ দেখতে চাই না, যদি কোনমতে সংসার চলার ব্যবস্থাটা হতো, তা' হলেই ভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম। আমি বিপুল ঐশ্বর্য্যও চাই না, বৃহৎ অট্টালিকাও চাইনা। আমি তোমাতে যে রত্ন পেয়েছি, তাই আমার অতুল সম্পদ,—কেবল যদি অন্নবস্ত্রের সংস্থানটা হ'তো, তা হ'লেই হতো।"

এই বলিয়া রমেশচন্দ্র কতক্ষণ নীরব থাকিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুনীতিও কি বলিবে ঠিক করিতে না পারিয়া স্বামীর হস্তাঙ্গুলির নথ খুঁটিতে লাগিলেন।

সহসা মনে যেন কি একটা উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এরূপ মুখের ভাব করিয়া সুনীতিকে আহ্বান করিয়া রমেশচন্দ্র বলিলেন—"সুনীতি, আমার ইচ্ছা হয়, ওকালতি ছেড়ে দিই, কোনও চাকরী গ্রহণ করি। এই ব্যবসায়ে আমার কিছু হবে না, সহায় সম্পদ না থাকলে এ ব্যবসায়ে সুবিধা হয়ে ওঠে না। কি বল, তোমার কি মত ?"

সুনীতি আনত নয়ন স্বামীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিলেন—"সে বিষয়ে—আমি কি বলবো, আমি কি বুঝি ? তুমি যা সুবিধা মনে কর, তাই কর।"

"হাঁ, সুনীতি, আমি চাকরীরই চেষ্টা করবো। আমি ঠিক বুঝেছি, এ ব্যবসায়ে আমার সুবিধা হবে না। এ ব্যবসায় ধ'রে দিন দিন কেবল সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছি। তোমাকে বিবাহ করে হাতে যে কিছু টাকা হয়েছিল, তা ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে সব ফুরিয়েছে, শেষে তোমার অলঙ্কার গুলোও এক এক ক'রে প্রায় সব বাঁধা দিতে হয়েছে। তোমার দিকে ফিরে চাইতে আমার বুক ভেঙ্গে যেতে চায়—এ যাবৎ একখানা গহনা দেওয়া দূরে থাক, একখানা ভাল কাপড় পর্য্যন্ত দিতে পারলাম না; কিছুতো দিতে পারিই নাই, তার উপর আবার তোমার যা ছিল, তা নিয়ে সব নষ্ট করলাম। শুধু তা নয়, পরিশ্রম করতে করতে তোমার কি শরীর কি হয়ে গেছে, এমন সোনার মত বর্ণে কালিমা পড়েছে, রক্তগণ্ড পাণ্ডুর হয়ে কপোল জেগে উঠেছে। না, সুনীতি, তোমার এ

কষ্ট আমি আর ব'সে দেখতে পারি না; আমি আজ হ'তেই চাকরীব চেষ্টা করবো। যদি ৪০।৫০৲ টাকা মাইনেরও কোনও পদ পাই তা সানন্দে গ্রহণ করবো।”

সুনীতি আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—“তা চাকরী সম্বন্ধে যা করার, কর; কিন্তু আমার গহনা ও শরীর সম্বন্ধে যে কথাগুলি বললে, তাতে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। আমার তুমিই সব, অলঙ্কার দিয়ে আমি কি করবো? এ গহনা শুধু আমারই বা কি? আমারও যা, তোমারও তা। সংসারের খরচের জন্য তা বাঁধা দিতে হয়েছ, তাতে তোমার একার দোষ কি? সংসারের ভার তোমারও যেমন, আমারও তেমন;—তবে পুরুষ মানুষ অর্থ উপার্জ্জন করে, মেয়ে মানুষ গৃহের কর্ম্মাদি করে। যখন গ্রহ বৈগুণ্যে বাহির হ'তে যথেষ্ঠ অর্থাগম হ'তে পারছে না, তখন কি রমণী আপনার অলঙ্কার—যা অঙ্গের ভূষণ মাত্র এবং যা গৃহে সঞ্চিত সম্পত্তি স্বরূপ—আবদ্ধ করে রাখবে, সংসারের প্রয়োজনে বা'র করে দিবে না? অবশ্যই দিবে, নতুবা তার গৃহলক্ষ্মী নামে দোষ পড়বে। তারপর আমার রূপ, আমার শরীর! রমণীর রূপ ও শরীর কার জন্য, কিসের জন্য? স্বামীর জন্য, স্বামী-সেবার জন্য। স্বামীর সেবায়, স্বামীর কাজে যদি সে রূপের হানি হয়, যদি শরীর শীর্ণ হয়, তবে তাতে ক্ষতি কি? যদি তুমি আমার দেবতা, আমার জীবিত ঈশ্বর সংসারের দুর্ভাবনায়, আমার অন্নবস্ত্রের চিন্তায় এমন দেবতাদুর্ল্লভ কান্তি বিনষ্ট করতে বসেছ; তবে আমার এই রূপ ও শরীর এমন একটা কি যত্নের বস্তু? যদি আমার এই রূপ ক্ষয় করে, এই শরীর পাত ক'রে তোমাকে সুস্থ করতে পারতাম, তোমাকে সুখী দেখতে পারতাম,

তবে আমার রমণী-জন্ম সফল সার্থক, মনে করতাম। কিন্তু কি করবো, আমার যে সে শক্তি নাই, ভগবান্ যে নারীজাতিকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী ক'রে সৃষ্টি করেছেন...

"কৈ গো দিদি, কি করছো? ওমা, একি? ভাত যে সব উতলে পড়ে যাচ্ছে, দিদি গেল কোথায়!

কাহার এই কথা শুনিয়া সুনীতির হুঁস হইল; উনানে যে ভাত চড়াইয়া আসিয়াছেন, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দ্রুতপদে রান্নাঘরে গেলেন,—দেখিলেন ভাত সিদ্ধ হইয়া হাঁড়ির মুখের সড়া ঠেলিয়া উথলিয়া পড়িতেছে এবং তাহা দেখিয়া এক প্রতিবেশিনী রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া ঐরূপ বলিতেছে।

সুনীতি ক্ষিপ্রহস্তে হাঁড়ির মুখ হইতে সড়া নামাইয়া প্রতিবেশিনীকে বলিলেন—"কি গো, কখন এসেছ? এই, ঐ ঘরে বাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে ভাতের কথা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাগ্যে তুমি এসেছিলে, নইলে পোড়া লেগে যেত।"

প্রতিবেশিনীটি বৃদ্ধা— গোপ জাতীয়া। বড় ভাল মানুষ, সুনীতিকে বিশেষ স্নেহ করে। বৃদ্ধার বাড়ী রমেশচন্দ্রের বাসার অল্প কিছু দূরেই। তাহার সংসারে কোন অনাটন নাই— তাহার তিন ছেলে, অনেক গুলি গরু আছে, স্থানীয় বহু ভদ্র পরিবারে দুধ যোগায়। রমেশচন্দ্র ও দিন আধসের করিয়া দুধ লইয়া থাকে, এবং এই বৃদ্ধাই সুনীতির প্রতি স্নেহবশে প্রত্যহ নিজে দুধ লইয়া আসে। শুধু তাহা নহে, প্রতিদিন দুপ্রহরে যখন রমেশচন্দ্র আদালতে যান, সুনীতি একাকী বাসায় থাকেন, বৃদ্ধা এই বাড়ীতে আসিয়া সুনীতির কাছে সমস্ত দিন কাটায়। বৃদ্ধা বলে—

তাহার একটি মেয়ে ছিল, সে আজ ১৬ বৎসর হইল ৪ বছরের হইয়া তাহাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গিয়াছে; সে যদি থাকিত, এত দিনে এত বড় সুনীতির মত নাকি হইত। সেই মৃতা কন্যার স্মৃতি হইতে এবং সুনীতির গুণে ও স্বভাবেও কতকটা বটে, বৃদ্ধা সুনীতিকে প্রায় আপন কন্যার ন্যায়ই স্নেহ করে। সুনীতির বয়স সম্বন্ধে বৃদ্ধার অনুমান বড় ভুল হয় নাই। সুনীতির এই একুশ বৎসর বয়স। রমেশচন্দ্র স্ত্রী অপেক্ষা প্রায় ৮ বৎসরের বড়। তাহাদের বিবাহ আজ প্রায় ৯ বৎসর হয় হইয়াছে।

বৃদ্ধা সুনীতির কথায় বলিল—"এই মাত্র এসেছি, দিদি। তা, বাবু ভাল হয়েছেন, অসুখ সেরেছে?"

সুনীতি হাঁড়ি নামাইয়া ভাতের মাড় গালিতে গালিতে বলিলেন—হাঁ, দিদি, কিছু কমেছে। বসো, মাড়টা গেলে নিই।"

উভয় উভয়কে দিদি ডাকিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

"'যখন সময় আসে,
কোথা হ'তে কি
ঘটে যায়, বুঝা ভার;
বৃথা চেষ্টা ধী!"

রমেশচন্দ্র অনেক চেষ্টা করিতে করিতে এক জমীদারের একটি সব ম্যানেজারি পদ পাইলেন। রাজসাহী অঞ্চলে এই চাকুরিটী মিলিল। শ্রীযুক্তা ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী সেই জমীদারীর অধিকারিণী। ব্রহ্মময়ীর স্বামী পৈতৃক সম্পত্তির মালিক হইয়া বৎসর চারেক ভোগ করার পর পরলোকগামী হন। ব্রহ্মময়ী সে সময় মাত্র ১৭ বৎসরের যুবতী। কোন সন্তান জন্মে নাই। কাজেই ব্রহ্মময়ীই স্বামীর বিত্তের উত্তরাধিকারিণী ও মালিক হইলেন। স্বামী মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি উইল করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে যথাক্রমে একটি অভাবে আর একটি এই ভাবে পাঁচটী পর্য্যন্ত পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিবার অধিকার দিয়া গিয়াছেন ব্রহ্মময়ীর বয়ঃক্রম এক্ষণে বত্রিশ, কিন্তু দেখিতে বিশ বাইশের উপর অনুমান হয় না। অসামান্যা রূপবতী; এখনও রূপের উচ্ছ্বাসে তাঁহার সকল অবয়ব তরঙ্গায়িত। যদিও বিধবা, যদিও তাঁহার রূপের এখন কোনও আবশ্যকতা নাই, তথাপি তাঁহার দাসীর প্রমুখাৎ সকলে অবগত আছে যে তিনি রূপটি মাজিয়া ঘষিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। নানালোকে আরও নানাকথা তাঁহার সম্বন্ধে পরস্পর বলাবলি করিয়া থাকে, তবে সে সব কথা কতদূর সত্য তাহা আমরা এখনও বলিতে পারি

না, কারণ এযাবৎ আমরা তাঁহার জীবনের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিতে চেষ্টা করি নাই; ক্রমে অবশ্য জানিবার সুযোগ পাইব। তবে এই পর্য্যন্ত অনুমান করা যাইতে পারে যে ভাল মন্দ পুরুষ রমণী উভয়ের মধ্যেই আছে,—যথেষ্ট প্রলোভনে এবং যথেষ্ট সুযোগে যেমন পুরুষও বিপথগামী হইতে পারে, রমণীও হইতে পারে; যদিও সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা রমণীরা অধিক দৃঢ়চরিত্রা ও ধর্ম্ম ভয়ে ভীতা। ব্রহ্মময়ী মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে, পূর্ণযৌবনকালে, যৌবনকালের সমুচিত ও স্বাভাবিক সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, বিলাস সম্ভোগের পিপাসা লইয়া যখন বার্ষিক ২০হাজার টাকা আয়ের বিপুল সম্পত্তির অধীশ্বরী হইলেন এবং এই প্রলোভনময় সংসারে আপনার কর্ত্রী আপনি হইলেন,—তখন সমধিক চরিত্রবল ও ধর্ম্মজ্ঞান অভাবে, একটু এদিক ওদিক হওয়া একেবারে অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নয়। সে যাহাই হউক, লোকে তাঁহাকে খুব সচ্চরিত্রা বলিয়া বিশ্বাস করে না। তাহাদের তাহা না করিবার প্রকাশ্যে কোন কারণ ঘটিয়াছে কিনা, জানি না, তবে একটি বিষয় আছে যাহা হইতে লোকের এইরূপ ধারণা জন্মিবার হেতু হইয়া থাকিতে পারে। সেটি এই—স্বামিকৃত উইল বলে ব্রহ্মময়ী এযাবৎ দুটী পোষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুটীই প্রায় একবয়সে, কৈশোরে পদার্পণ করিতেই —অনমুভবনীয় কারণে আকস্মিক রোগে, হঠাৎ এমন কি ডাক্তার কবিরাজ ডাকিবার অবসর হইবার পূর্ব্বেই ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সময় বেশ সুস্থ, প্রফুল্ল, মৃত্যুর কোন দূর সম্ভাবনাও কাছে নাই, কিন্তু রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই শ্মশান ভস্মে পরিণত। দুই দুইটী বালকের এই এক দশা দেখিয়া সকলের মনে নানারকম সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছে।

সেই কারণ হইতেই ব্রহ্মময়ীর চরিত্র সম্বন্ধে সাধারণে বিশ্বাস হারাইয়াছে; তাহারা অনুমান করে যে জমীদারিণী ইচ্ছা করেন না যে কোন পোষ্যপুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করে এবং তাঁহার ক্রিয়া কলাপের উপর খরদৃষ্টি রাখে; কাজেই পোষ্য গ্রহণ করিয়া—পোষ্যপুত্র না রাখিলে আবার নিতান্ত খারাপ দেখায়, এই জন্য পোষ্য গ্রহণ করিয়া বয়ঃপ্রাপ্তির কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার আয়ত্তাধীন লোকের সাহায্যে, গোপনে বিষপ্রয়োগে অথবা অন্য কোন কৌশলে, তাহাকে নিজের পথ হইতে অপসারিত করিয়া দেন;—অর্থে সব হয়, অর্থের বলে সকলের মুখ বাঁধিয়া ফেলেন, কেহ কোন কথা বলে না।

কৈলাস চন্দ্র বসু ব্রহ্মময়ীর ষ্টেটের ম্যানেজার। তিনি দিব্য কান্তিমান পুরুষ, বয়স চল্লিশের কিছু উপর। তিনি বহু দিন অবধি এই ষ্টেটে আছেন। অন্তঃপুরে তাহার অবারিত গতি, কর্ত্রী তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আসিয়া আলাপ করেন। অনেক সময় দাসদাসীরা নাকি তাঁহাদের বহু রাত্রে দেখা সাক্ষাৎ ও কৌতুক তামাসা করিতে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে। অন্দরের কথা বাহিরে আনিতে দাসদাসীরা যেমন কৌতুহলী, এরূপ বোধ হয় আর কেহ নয়। এই সব কথা শুনিয়াও লোকের মনে নানারূপ সন্দেহ জাগিবার কারণ হইয়াছে।

এই ষ্টেটের মধ্যে রমেশচন্দ্র সবম্যানেজারী পদ প্রাপ্ত হইলেন। রাজসাহীর একজন খ্যাতনামা উকীল তাঁহার দূর আত্মীয়, তাঁহার সহিত ম্যানেজার কৈলাস বাবুর নিতান্ত সৌহৃদ্য ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় ও সুপারিশিতে রমেশচন্দ্র এই চাকুরীটি

পাইলেন। এই পদের মাহিনা আপাততঃ ৭৫৲ টাকা, ক্রমে কর্ম্মদক্ষতানুসারে, বৃদ্ধি হইয়া ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইবে।

রমেশচন্দ্র মাসিক ৪০৲ টাকা মাহিনার কোন চাকুরী পাইলেই তুষ্ট হইতেন, সে স্থলে একেবারে ৭৫৲ টাকার চাকুরী পাইয়া ভগবানকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং নিয়োগ পত্র প্রাপ্ত হওয়া মাত্র রুদ্ধশ্বাসে আফিস হইতে ধাবমান হইলেন—আফিসের ঠিকানায় চিঠি আসায় উকীল লাইব্রেরীতে চিঠিখানা পাইয়াছিলেন—এবং বাসায় পৌঁছিয়া প্রাঙ্গণ হইতেই—"সুনীতি, সুনীতি" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। শয্যায় অর্দ্ধশয়ানে শুইয়া সুনীতি তখন বৃদ্ধা গোয়ালিনীর সঙ্গে আলাপ করিতেছিলেন। তখন বেলা প্রায় আড়াই প্রহর। এই সময় সহসা রমেশচন্দ্রের কণ্ঠে 'সুনীতি সুনীতি' আহ্বান শুনিয়া সুনীতির বুক ধড়ফড় করিয়া উঠিল; তিনি স্বামীর শরীর সম্বন্ধে বিবিধ আশঙ্কা করিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া দরজায় আসিলেন। অমনি রমেশ চন্দ্র তাহাকে বক্ষে ধরিয়া গদগদ ভাবে বলিলেন—"সুনীতি, প্রাণের সুনু, তুমি দেবী, তোমার কথা সত্য হয়েছে, সতীর বাণী কখনো মিথ্যা হয় না,—আমাদের সুদিন ফিরেছে।" রমেশচন্দ্র আনন্দের আবেগে ঘরে যে আর কেহ অন্ততঃ বুড়ী গোয়ালিনী থাকিতে পারে, তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুনীতি কিন্তু বড় লজ্জা পাইলেন; তিনি অস্ফুট স্বরে 'ঘরে গোয়ালিনী দিদি যে আছে' এই বলিয়া একটু সুখের হাসি হাসিয়া—কারণ তিনি বুঝিলেন নিশ্চয়ই কোন শুভ সংবাদ আছে—আপনাকে স্বামীর বাহু বেষ্টন হইতে মুক্ত করিয়া লইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি, বিষয় কি?" রমেশচন্দ্র, ঘরে গোয়ালিনী আছে

শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন; কিন্তু তখনই এক গাল হাসিয়া বলিলেন—'কে আছে? গোয়ালিনী দিদি? (আনন্দে তাহার মুখেও দিদি বাহির হইয়া গেল) তাতে আর কি হয়েছে, সে তো আমাদের আপনার লোকই। শুন, বড় সুখের সংবাদ, আমার চাকরী হয়েছে, মাইনে ৭৫৲, ক্রমে ১০০৲ টাকা হবে।" সুনীতির আনন্দের সীমা রহিল না। রমেশচন্দ্রের ভাল চাকুরী হইয়াছে, আর অর্থ কষ্ট বা চিন্তা ভাবনা থাকিবে না, ইহা ভাবিয়া তাঁহার যত আনন্দ না হইল, রমেশচন্দ্রের হাসি দেখিয়া তাঁহার অপার আনন্দ হইল, কারণ এইরূপ সুখহাসি তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বামীর মুখে দেখেন নাই। স্বামীর আনন্দেই তাঁহার পরম আনন্দ। তিনি আনন্দের বশে ছুটিয়া গেলেন এবং গোয়ালিনী দিদির গলা ধরিয়া বলিলেন "দিদি, বড় ভাল খবর, বাবুর ভাল চাকরী হয়েছে"।

বৃদ্ধা এ যাবৎ অবাক হইয়া সব দেখিতেছিল এবং রমেশচন্দ্র যখন তাহার সাক্ষাতে সুনীতিকে আলিঙ্গণে ধরিলেন তখন সে কিছু লজ্জা পাইয়া চক্ষু অন্যদিকে ফিরাইয়াছিল; কিন্তু যখন আবার রমেশচন্দ্রের কথা—"কে আছে, গোয়ালিনী দিদি? তাতে কি হয়েছে, সে তো আমাদেরই আপনার লোক" তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তাহার বড় হর্ষ উপস্থিত হইল এবং সে নয়ন ফিরাইয়া কি কথায় কৃতজ্ঞতা ও হৃদয়ের হর্ষ প্রকাশ করিবে, ঠিক করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল; এমন সময় সুনীতি আসিয়া তাহার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিল এবং সুসংবাদ জ্ঞাপন করিল। বৃদ্ধাও সুনীতিকে জড়াইয়া ধরিল এবং হর্ষগদগদ স্বরে বলিল—"বড় সুখী হ'লাম, দিদি; ঈশ্বর তোমাদের দিন দিন উন্নতি করুন,

দিন দিন ধনে জনে ঘর পূর্ণ করুন। আহা তুমি এমন মেয়ে, বাবু এমন মানুষ—সকলেই ভাল বলে, তোমাদের ভাল হবে না? নিশ্চয়ই হবে।”

এই বলিয়া বৃদ্ধা রমেশচন্দ্রের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কোথায় বাবু কি চাকরী হলো?

সুনীতিরও তাহা জানিবার ইচ্ছা, তিনি বৃদ্ধার প্রশ্নে সায় দিয়া হর্ষোৎফুল্ল দৃষ্টিতে স্বামীর পানে চাহিলেন। রমেশচন্দ্র তখন একে একে সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

বৃদ্ধা সমস্ত অবগত হইয়া একটা চাপা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—“বাবু, সে যে অনেক দূর। তবে তোমরা আমাদের ছেড়ে যাবে? তবে দিদি, আমাকে ছেড়ে যাবে? তা যাও, তোমরা সুখে থাক। যেখানে সুখে থাক, সেখানেই যাও, আমার আর কয়টা দিন! সুখে দুঃখে একরকমে কেটে যাবে। তা দিদি, যাও, আশীর্ব্বাদ করি পতি সোহাগিনী হ'য়ে থাক, শীগ্‌গির শীগ্‌গির কোলে সোণার ছেলে আসুক! —হ্যাঁ, দিদি, ছেলে হ'লে আমাকে সে সুখবরটা কিন্তু দিও, দিবে তো? ভুলে ত' যাবে না?”

সুনীতির মুখ লজ্জায় রক্তিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সলজ্জ নয়নে বৃদ্ধার দিকে একবার চাহিয়া, অধরে অধরে ঈষৎ হাসিলেন। বৃদ্ধা সেই চাহনি'ও হাসিতে বুঝিল যে যদি ভগবান্ কখনো সে সুখের দিন দেন, সুনীতি নিশ্চয়ই তাহার কথা ভুলিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"পতিপ্রেমে ভরপূর
যে নারীর বুক
তুচ্ছ তার অলঙ্কার—
তুচ্ছ অন্নসুখ।"

রমেশচন্দ্র ব্রহ্মময়ী চৌধুরাণী সম্বন্ধে কিছু জানেন না, কিছু শোনেনও নাই। চাঁদপুর রাজসাহী হইতে রেলষ্টীমারে দুই দিনের পথ; অতদূর ব্রহ্মময়ীর চরিত্র সম্বন্ধে যে নানালোকে নানাকথা বলে, সে সংবাদ পৌঁছায় নাই। রমেশচন্দ্র পত্রিকায় এবং অন্যান্য উপায়ে চাকুরীর সন্ধান করিতে করিতে জমীদারিণী ব্রহ্মময়ীর ষ্টেটে সবম্যানেজারীর পদ খালি আছে, অবগত হইয়া তজ্জন্য দরখাস্ত দিয়াছিলেন এবং রাজসাহী সহরে তাঁহার যে দূর আত্মীয়টি ওকালতী করিতে ছিলেন, তাঁহাকে ঐ চাকুরীটি যাহাতে হয়, তদ্বিষয়ে একটু চেষ্টা করিতে পত্রের দ্বারা মিনতি করিয়াছিলেন। অদৃষ্টক্রমে সেই আত্মীয় উকীল মহাশয় রাজসাহীতে বিশেষ খ্যাতি সম্পন্ন ও প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন এবং তাঁহার সহিত ষ্টেটের ম্যানেজার কৈলাস বাবুর নিরতিশয় সদ্ভাব ছিল। গতিকেই অপেক্ষাকৃত অনায়াসে রমেশচন্দ্র চাকুরীটি প্রাপ্ত হইলেন।

নিয়োগপত্র পাইয়া রমেশচন্দ্র যথাযথ সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এই মাসেই চাকুরীতে উপস্থিত হইতে হইবে। মাত্র আর বারো দিন হাতে আছে। রমেশচন্দ্র স্ত্রীকে বলিলেন—

"এখন ত' কিছু টাকার দরকার। বাসা ভাড়া, দোকানের বাকী, অন্যান্য আর যে খুচরা দেনা আছে, তাহাতো সবই শোধ করে যেতে হবে, কি করে এই টাকার সংস্থান হয়? হাতে ত' বেশী কিছু নাই।" সুনীতি বলিলেন—"তার জন্য ভাবনা কি? আমার এই অনন্ত জোড়া কোথাও রেখে টাকা নিয়ে এসো। অনন্ত বাঁধা রেখে বোধ হয় ২০০৲ টাকা পাওয়া যাবে, ১২ ভরির অনন্ত, সোণাও খুব ভাল। নিশ্চয়ই ২০০৲ টাকা পাওয়া যাবে। ঐ টাকাতেই এ দিককার সব দেনা পাওনা শোধ হ'য়ে আমাদের যাওয়ার খরচেরও সংস্থা হবে;" রমেশচন্দ্র একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—"হাঁ, তা হতে পারে, সুনীতি, কিন্তু তোমার ত' আর ঐ হাতের বালা জোড়া বই আর গহনা রইল না। হায়, তোমাকে একেবারে অলঙ্কার শূন্য করলাম!" "আবার ঐ কথা? যাও তুমি আমাকে একেবারেই ভালবাস না, সম্পূর্ণ পর মনে কর।" এই বলিয়া অভিমানচ্ছলে সুনীতি অন্যদিকে ফিরিয়া মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন। রমেশচন্দ্র বুঝিয়া নিকটে আসিয়া প্রেমভরে সুনীতির চিবুক টিপিয়া বলিলেন—"পাগলি, তুমি আমার পর হ'লে, আমার আপন কে?" সুনীতির মান ভাঙ্গিল, মুখ তুলিলেন—"তবে বল আর ও কথা কোনও দিন বলবে না!"

"একেবারে শপথ করতে হবে?"

"হাঁ"

"আচ্ছা করলাম; আর কোনও দিন ওকথা বলবো না।"

"যদি বল, তবে—"

"আবার শাস্তির ও বিধান করতে হবে নাকি?"

"হাঁ, নইলে যে তুমি বড় দুষ্টু।"

"আচ্ছা তবে এই বিধান হলো—যদি আবার ওমন কথা বলি, তাহা হ'লে তুমি আমার সঙ্গে এক রাত্রি কথা বলো না। ইহা অপেক্ষা আমার আর কঠিন দণ্ড কি হবে?"

সুনীতি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—"এই বুঝি তোমার শাস্তি হলো? এ যে উল্টো আমাকে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হলো। আমি বুঝি তোমার সঙ্গে কথা না ক'য়ে থাকতে পারবো? এতো বেশ বিধান হলো দেখচি!

"তবে আর কি বিধান করবো?

"আমি কি জানি, তুমি বল।

রমেশচন্দ্র তখন হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তবে পাঁচশ মুদ্রা জরিমানা দেব। সুনীতি চোখের কোণে হাসি লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি মুদ্রা?"

"কি মুদ্রা—তাও বলতে হবে? তবে শুন—তোমার গোলাপ গণ্ডে অধর সংযোগে।"

সুনীতি তুষ্ট হইলেন। স্বামীকে বাধা দিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝেছি, আর বলতে হবে না,. ঐ মুদ্রাই জরিমানা চাই। নেও, এখন এই অনন্ত নিয়ে যেয়ে টাকার যোগাড় কর।"

সুনীতি বাহু হইতে খুলিয়া অনন্ত জোড়া স্বামীর হাতে দিলেন।

রমেশচন্দ্র অনন্ত হাতে লইয়া বলিলেন—"টাকার ব্যবস্থা ত' হলো। তারপর আরও কথা আছে। রাজসাহী আর কোনও দিন যাই নাই। কি রকম স্থান, জল বায়ু কি রকম, তা জানি না। ভাল বাসাবাড়ী পাওয়া যাবে কিনা—কোথায়ইবা

থাকতে হবে—সদরে থাকতে হবে, না, মফঃস্বলে ঘুরতে হবে—কিছুই বুঝতে পারছি না। এ অবস্থায় একেবারে তোমাকে নিয়ে যাওয়া উচিত, না, এক্ষনে আমার একা যাওয়া সঙ্গত, তাই ভাবছি। আমার মনে হচ্ছে—এখন আমার একাই যাওয়া ভাল, তুমি আপাততঃ পিত্রালয়ে কয়েকদিন থাক, পরে সেখানকার সমস্ত অবস্থা বুঝে, বাসা প্রভৃতির সুবিধেমত বন্দোবস্ত করে তোমাকে নেব। তুমি কি বল?

সুনীতি বলিলেন—"তুমি যা কর্ত্তব্য মনে কর, তাই কর। আমার এ সব বিষয়ে কর্ত্তব্য বুদ্ধি কতটুক্? তবে, আমি তোমাকে ছেড়ে যে কি অবস্থায় থাকবো, সেটা যেন মনে থাকে। আমার কিন্তু যত দিন আবার তোমার কাছে না যেতে পারবো ততদিন আহার নিদ্রা একরকম থাকবে না।"

"আমারও কি থাকবে সুনীতি? আমি কি তোমায় না দেখে শান্তিতে থাকতে পারবো? যত শীঘ্র আমি তোমায় নিতে পারি, তা নিশ্চয়ই করবো।"

সুনীতি হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, কার্য্যে দেখবো কথা কত দূর ঠিক থাকে। অন্ততঃ প্রত্যহ একখানা যেন চিঠি পাই, সেই চিঠিতেই কিন্তু আমার প্রাণ পড়ে থাকবে।

রমেশ—তা আর বলতে হবে না। প্রত্যহ চিঠি না লিখলে আমিও একাকী সেই প্রবাস জীবনে আনন্দ পাব না। তোমারও যেন উত্তর সঙ্গে সঙ্গে যায়।

সুনীতি—তাতে অন্যথা হবে না। চিঠি পড়তে পড়তেই উত্তর লিখবো।

তারপর অন্যান্য কথা হইয়া স্থির হইল যে রমেশচন্দ্র রাজসাহী

যাইবার ৪।৫ দিন পূর্ব্বে সস্ত্রীক শ্বশুরালয় যাইবেন এবং সেখানে দিন দুই থাকিয়া সুনীতিকে তথায় রাখিয়া, রাজসাহী যাইবেন পরে যত শীঘ্র হয়, যথাবিহিত বন্দোবিস্ত করিয়া, হয় নিজে আসিয়া অথবা বিদায় না পাইলে, অন্য কোন লোকের দ্বারা সুনীতিকে নিজ কর্ম্মস্থানে নিবেন।

এইরূপ কথা স্থির হইলে রমেশচন্দ্র অনন্ত জোড়া জামার পকেটে লইয়া টাকা আনিতে বাহির হইলেন। সুনীতি গৃহ কার্য্যে মন দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

"দৃঢ়চিত্ত, শুদ্ধ প্রাণ ধার্ম্মিক দম্পতি"
কর্ত্তব্য সাধিতে কভু নয় ক্ষুন্নমতি ॥

রমেশচন্দ্র রাজ সাহী আসিয়া আপনার কাজ গ্রহণ করিয়াছেন। সুনীতি পিত্রালয়ে রহিয়াছেন। উভয়ে শারীরিক বিচ্ছেদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু মানসিক সম্বন্ধে তাহারা প্রতিমুহূর্ত্ত এক সঙ্গেই রহিয়াছেন। বিরহে প্রণয় গভীর হয়—পরস্পরের সঙ্গলীপ্সা বলবতী হয়—একের চিন্তায় অন্যের প্রাণ সমধিক নিমজ্জিত থাকে। এক্ষণে তাই, যে আকর্ষণ, যে পরস্পর মিলন-সাধ—শরীর ও মনে বিদ্যমান ছিল, তাহা সম্পূর্ণ কেবল মাত্র মনে পর্য্যবসিত হইয়া, মানসিক সম্বন্ধ, প্রাণের নৈকট্য,—যাহাতে প্রকৃত প্রণয়ের, বিমল স্বর্গীয় প্রেমের মুক্তি ও স্থিতি—অধিকতর দৃঢ় ও ঘনিষ্ঠ হইল। পূর্ব্বে যদিও কখনও কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া একের পক্ষে অন্যকে ক্ষনেকের জন্যও ভুলা সম্ভব হইত, এক্ষণে আর তাহা হয় না। এখন প্রতিক্ষণ প্রতি মুহূর্ত্ত, সহস্র কার্য্যের মধ্যেও একের স্মৃতি অন্যের হৃদয়ে জাগরূক থাকে এবং সেই স্মৃতির মাধুর্য্যে বিচ্ছেদের যে দুঃসহ জ্বালা তাহার কথঞ্চিৎ শমতা হয়। কেহ কাহারও কথা ভুলেন নাই—প্রতিদিন উভয়ে উভয়ের নিকট এক একখানা বিস্তৃত ভাবে কোমল মধুর ভাষায় প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢালিয়া পত্র লিখেন, এবং কাহারও পত্রপাঠ উত্তর দিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব হয় না। সহস্র কার্য্য সহস্র বাধা বিঘ্ন থাকি-

লেও এই কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয় না। এই চিঠির সঙ্গে যেন তাঁহাদের প্রাণ গাঁথা,—প্রতিদিন ডাকপিওনের আসিবার মুহূর্ত্তটির জন্য উভয়েই প্রাতঃকাল হইতে উৎকণ্ঠ প্রতিক্ষায় কাল যাপন করেন; ডাক হরকরার সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্য্যন্ত কেহই মুহূর্ত্তের জন্য সুস্থ থাকিতে পারেন না। ধন্য দম্পতি, ধন্য দাম্পত্য প্রেম। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে নির্ম্মল প্রেম, তাহাই যথার্থ বিশুদ্ধ পবিত্র প্রেম। এই প্রেম হইতে সুখের ও শান্তির আর মানব জীবনে কিছুই নাই। সংসারে সকল মানবই, রাজা হউক প্রজা হউক, নানারকম জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করে—কিন্তু সেই জ্বালায় সেই একমাত্র বিমল দাম্পত্য প্রেমেই শান্তি, দাম্পত্য প্রণয়েই আনন্দ! এই প্রেমে মর্ত্ত্য স্বর্গ হয়, শোকে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, দারিদ্র্য পীড়িতগৃহে হাসি বিরাজ করে।

রমেশচন্দ্র কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সদরেই থাকিতে হইবে, তবে মাঝে মাঝে মফঃস্বল যাইয়া মহালের অবস্থা ও নায়েব তহশীলদারদিগের কার্য্য পরিদর্শন করিতে হইবে। রমেশচন্দ্র ইহাতে খুব প্রীত হইলেন, কারণ এই অবস্থায় সুনীতিকে শীঘ্রই এস্থানে আনা চলিবে। এইরূপ বুঝিয়া রমেশচন্দ্র বাসা দেখিতে লাগিলেন। জমীদার বাড়ীর নিকটেই একখানা ছোট বাসা পাইলেন। মাত্র তাহারা স্বামী স্ত্রী দুইজন; এই দুইখানা কোঠা বিশিষ্ট বাড়ীতেই চলিবে, মনে করিয়া রমেশচন্দ্র ঐ বাসাই ঠিক করিলেন।

বাসায় ঠিক হইয়া বসিয়া আগামী মাসেই সুনীতিকে আনিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

কৈলাস বাবুকে রমেশচন্দ্র আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করেন

একে তিনি ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী তার উপর তাঁহারই অনুগ্রহে এই চাকুরী মিলিয়াছে; কাজেই রমেশচন্দ্র তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি ও সম্মান করিয়া থাকেন এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার আদেশ ও পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করেন। কৈলাস বাবুও রমেশচন্দ্রের সুকুমার আকৃতিতে ও তাঁহার বিনীত স্বভাবে তাঁহাকে স্নেহের চোক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং তাহার কর্ত্তব্যসমূহ বিহিত উপদেশে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

কয়েকদিন যায়, একদিন কৈলাস বাবু বলিলেন—"রমেশ বাবু, আপনার এখন একবার মফঃস্বলে যেয়ে, মহালগুলি জেনে শুনে আসা আবশ্যক। মহাল পরিদর্শনও আপনার কার্য্যের মধ্যে; বৎসরে অন্ততঃ আপনার ৩।৪ বার যেতে হবে। কোনও কোন মহালে প্রজারা বড় বাধ্য নয়, নায়েবরা তাদের শাসনে রাখতে নিরতিশয় ক্লেশ পায়, কাজেই প্রধান কর্ম্মচারীদের কাউকে সেই সব মহালে মধ্যে মধ্যে যেতে হয়। সবম্যানেজারই বরাবর ঐ কাজে যেয়ে থাকেন। তাই আপনি যখন এই পদে নূতন নিযুক্ত হয়েছেন, তখন আপনারই এখন একবার মহালে মহালে যেয়ে প্রজাদের সঙ্গে জানা শুনা করা সঙ্গত বিবেচনা করি।"

রমেশচন্দ্র সবিনয়ে বলিলেন—"তা বেশ যাব। আপনি যেরূপ পরামর্শ দেবেন, কার্য্য নির্দ্দেশ করবেন, আমি সেরূপই করবো।"

কৈলাস বাবু কহিলেন—"হাঁ, আপনি আগামী মাসের প্রথম ভাগেই মফঃস্বল যাবার উদ্যোগ করুন, মফঃস্বলে মাস খানেক ঘুরে এসে এখানকার কাজে মনোনিবেশ করবেন।"

রমেশচন্দ্র—"আজ্ঞা, আচ্ছা!"

তারপর রমেশচন্দ্র কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া কৈলাস বাবুকে বলিলেন—"কর্ত্রীর সঙ্গে আমার কি একবার সাক্ষাৎ ক'রে আমার সম্মান, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত নয়?"

কৈলাস বাবু প্রশ্নটি শুনিয়া কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তারপর কতক্ষণ রমেশচন্দ্রের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন—

"তা, হাঁ—দেখা করাতো একবার কর্ত্তব্যই। তবে তিনি সাধারণতঃ সকলের সহিত সাক্ষাৎ করেন না। কেবল অতি পুরাতন কর্ম্মচারীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করে' থাকেন। আচ্ছা. আমি তাঁকে বলবো, আপনার ভক্তি ও সম্মানের কথা জানাবো। তিনি যদি তা শুনে সাক্ষাতে সম্মতি দেন, তবে বরং আপনি দেখা করবেন। তিনি কখনো কখনো পর্দ্দার পেছনে থেকে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাদের ভক্তি সম্মান গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছা করলে, সেরূপ বন্দোবস্তও হতে পারবে।"

রমেশচন্দ্র সেই প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইয়া কৈলাস বাবুকে যথাবিহিত অভিবাদন করিয়া নিজ বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

বাসায় আসিয়া সমস্ত বিষয় প্রকাশ করিয়া সুনীতিকে এক পত্র লিখিতে বসিলেন। গত কাল পর্য্যন্ত, এযাবৎ যে সকল পত্র প্রতিদিন লিখিয়াছেন, তাহাতে এখানে বাসা ঠিক হইয়াছে, আগামী মাসের প্রথম ভাগেই সুনীতিকে আনিবেন, এইরূপ লিখিয়াছেন। সুনীতি সেই সংবাদে নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া কত হর্ষের সহিত উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু আজ ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে কথাবার্ত্তায় যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইল, তাহাতে আর আগামী

মাসে সুনীতিকে এখানে আনা চলে না। তাই সমস্ত কথা বিস্তৃত ভাবে বিবৃত করিয়া লিখিতে বসিলেন।

চিঠিখানা লিখিতে লিখিতে রমেশচন্দ্রের মনে যথেষ্ট বেদনা উপস্থিত হইল, কারণ বড় আশা করিয়াছিলেন, শীঘ্রই সুনীতিকে কাছে পাইবেন, শীঘ্রই প্রিয়তমার মুখ দেখিয়া এই বিরহ জ্বালার শান্তি করিবেন। কিন্তু তিনি সেই বেদনাকে অধিকক্ষণ আপনার হৃদয়কে মথিত করিতে দিলেন না। তিনি যদিও প্রেমিক, পত্নী প্রেমে বিহ্বল, তথাপি দুর্ব্বলচেতা নন; প্রেমের খাতিরে কর্ত্তব্যকে পদদলিত করিতে তিনি কখনও প্রস্তুত নন। তাই অচিরে প্রাণকে স্থির ও শান্ত করিয়া চিঠিখানা সমাপন করিলেন এবং ডাকে পাঠাইয়া দিলেন।

প্রত্যহ সুনীতির পত্র আসে, এই চিঠিরও যথাসময়ে উত্তর আসিল। সুনীতি রমেশচন্দ্রের যোগ্যা স্ত্রী। যদিও সুনীতি আগামী মাসে স্বামীর কাছে আসিতে পারিবে আশায় অপার আনন্দে ভাসিতেছিলেন, এবং যদিও যখন রমেশচন্দ্রের পত্রে অবগত হইলেন যে তাহা ঘটিয়া উঠিবে না, তাহার প্রাণে একটা গভীর হতাশার আঘাত লাগিল এবং তিনি হৃদয়ে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন কিন্তু তাহারও চিত্তের বল যথেষ্ট, কর্ত্তব্য জ্ঞান প্রচুর; তিনিও সমস্ত অবস্থা মনে মনে আলোচনা করিয়া আগামী মাসে যে স্বামীর স্থানে আসিতে পারিলেন না তাহার যথাযথ কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং মনকে বুঝাইয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন। তাঁহার পত্রে সেইরূপ ভাবই প্রকাশ ছিল। রমেশচন্দ্র স্ত্রীর পত্র পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলেন—বুঝিলেন সুনীতি শুধু প্রণয়িনী নহে, বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বিবেচনা শালিনীও বটে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সখি, কিরূপ হেরিনু চোখে,
সুখেতে ছিনু,
কেন চাহিনু,
অনল জ্বলিল বুকে।"

রমেশচন্দ্র মফঃস্বল যাইবার দিন ধার্য্য করিয়া তাহাব যথাবিধি উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দিন নিকটবর্ত্তী হইল। আর দুই দিবস পরে রমেশচন্দ্র মফঃস্বল রওনা হইবেন।

এই সময়ে রমেশচন্দ্রের মনে হইল যে মফঃস্বলে যাইয়া কত দিন থাকিতে হয়, নিশ্চয়তা নাই, এ অবস্থায় কর্ত্রীর সহিত মফঃস্বল যাইবার পূর্ব্বেই সাক্ষাৎ করা বিধেয়। তিনি মনে মনে ভাবিলেন—যিনি আমার কর্ত্রী ও প্রসাদদাত্রী, তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রেই ভক্তি অভিবাদন করা উচিত ছিল; এখনও তাহা না করিলে কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইবে এবং হয়তো তাহাতে কর্ত্রী ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া রমেশচন্দ্র কৈলাস বাবুর সহিত দেখা করিলেন এবং কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে কিনা, জিজ্ঞাসা করিলেন। রমেশচন্দ্র কহিলেন—"আমি আগামী পরশ্ব মফঃস্বল যাব স্থির করেছি, আমার ইচ্ছা, তৎপূর্ব্বেই যদি সম্ভব হয় আমার ভক্তি ও সম্মান কর্ত্রীর সহিত দেখা করে জ্ঞাপন করি।

কৈলাশ বাবু তৎশ্রবণে একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিয়া উঠিলেন

—"হাঁ, হাঁ, আপনাকে বলতে ভুলেই গিয়েছি। হাঁ, কর্ত্রীর সহিত আপনার সাক্ষাৎ করা সম্বন্ধে আমি আলাপ করেছিলাম, তিনি আপনার সহিত পর্দ্দার পশ্চাতে থেকে দেখা করবেন। আপনি মফঃস্বল যাবার পূর্ব্বেই দেখা করতে ইচ্ছা করেছেন, তা বেশ, আগামী কাল প্রাতে তার বন্দোবস্ত করবো। আমি আজ কর্ত্রীকে বলবো,—আপনি কাঁল দেখা করতে পারবেন।"

রমেশচন্দ্র শুনিয়া সুখী হইলেন এবং ম্যানেজার বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন।

পরদিন প্রাতে সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হইল। রমেশচন্দ্র সভক্তি অন্তরে প্রভুর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। কর্ত্রী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কক্ষে এক বহুমূল্য আসনে আসীনা হইলেন। রমেশচন্দ্র পর্দ্দার বহির্ভাগে থাকিয়া অতি সম্ভ্রমের সহিত প্রণত হইয়া নিজের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা অতি বিনীত ভাষায় জ্ঞাপন করিলেন। কর্ত্রী তাঁহার কথায় যথোচিত উত্তর দিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তিনি ঘন ঘন রমেশচন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং অল্প পরিচয়েই বহু কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। রমেশচন্দ্র মনে মনে ভাবিলেন—কর্ত্রী কি সদাশয়া ও অধীনদিগের প্রতি করুণা-ময়ী! তিনিও কর্ত্রীর সঙ্গে নিরতিশয় ভক্তি ও সম্মানের সহিত উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়া নানাবিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অধিক হইয়া উঠিল। তখন কর্ত্রী রমেশচন্দ্রের আলাপে ও সবিনয় ব্যবহারে নিরতিশয় তুষ্ট হইয়াছেন প্রকাশ করিয়া রমেশচন্দ্রকে সেদিন মধ্যাহ্নে তাঁহার বাড়ীতে আহার করিতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। রমেশচন্দ্র এই অনুগ্রহে বিশেষ প্রীত হইলেন।

মধ্যাহ্নে যথা সময়ে রমেশচন্দ্র স্নানাদি সমাপন করিয়া জমীদার বাড়ী আহার করিতে আসিলেন। বহির্ভাগে কিছু সময় অপেক্ষা করার পর, একটী দাসী আসিয়া "আহার প্রস্তুত হয়েছে, আসুন" বলিয়া রমেশচন্দ্রকে অন্দরে ডাকিয়া লইয়া গেল। রমেশচন্দ্র দাসীর সঙ্গে একটি অতিশয় মনোরম সুসজ্জিত কক্ষে উপস্থিত হইলেন;— দেখিলেন তাহার জন্য অতি যত্ন ও পারিপাট্যের সহিত আহারের স্থান রচনা করিয়া রাখা হইয়াছে। আরও দেখিলেন যে তিনি একা তথায় নিমন্ত্রিত, আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ নাই। তাঁহার একটু বিস্ময় উপস্থিত হইল, কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইল—বোধ হয় কর্ত্রী নিজ কৃপালু স্বভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া এইরূপ ভাবে তাঁহার প্রত্যেক নবাগত কর্ম্মচারীকে আহার করাইয়া থাকেন। তিনি ভাবিলেন—আহা, এইরূপ স্নেহময়ী করুণাশালিনী কর্ত্রীর অধীনে কার্য্যকরা কি সৌভাগ্যের বিষয়!

রমেশচন্দ্র এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, এই সময় পাচক ব্রাহ্মণ অন্ন ব্যঞ্জন সহ একখানা বৃহৎ রৌপ্য থালা ও কয়েকটী রৌপ্য বাটি সেই আসন সম্মুখে স্থাপন করিয়া তাহাকে আহারে বসিতে প্রার্থনা করিল। রমেশচন্দ্র রৌপ্য থাল ও বাটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এবং বহুবিধ সুগন্ধ ব্যঞ্জনাদির আয়োজন দেখিয়া একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। চমৎকৃত চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন—"একি—আমার এত সমাদর কেন? অনুগত দিগের প্রতি কি কর্ত্রীর এইরূপই সহৃদয় ব্যবহার?"

ঠাকুর পুনরায় বলিল—"বাবু, খেতে বসুন"। রমেশচন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি জুতাদি ত্যাগ করিয়া আহারে বসিলেন। ঠাকুর চলিয়া গেল।

রমেশচন্দ্র একমনে কর্ত্রীর অনুগ্রহ ও সদয় ব্যবহারের কথা চিন্তা করিতেছেনে, অন্য মনে আহার করিতেছেন ; সহসা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল—"ব্যঞ্জনাদি কিরূপ পাক হয়েছে ? রমেশ চন্দ্র সবিস্ময়ে মস্তক তুলিয়া দেখিলেন অনতিদূরে, দুই কক্ষের মধ্যবর্ত্তী দরজার পার্শ্বে কর্ত্রী স্বয়ং দাঁড়াইয়া তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। স্বয়ং কর্ত্রীকে দেখিয়া রমেশচন্দ্র লজ্জায় ও সম্ভ্রমে নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন—"আপনার অনুগ্রহ অসাম, ভৃত্যদিগের প্রতি আপনার স্নেহ ও কৃপা বিস্ময়কর, আমি এমন দেবীতুল্য করুণাময়ী, মাতৃতুল্য স্নেহময়ী কর্ত্রীর অধীনে যে কর্ম্ম পেয়েছি, ইহাতে আমি আমাকে ভাগ্যবান্ ও কৃতার্থ মনে করছি।"

"ছি, ওকি কথা বলছেন ? কর্ম্মচারীরা কি আমার পর ? আমার সংসারে আর কে আছে ? কর্ম্মচারীদের আমি আপনার লোক মনে করে থাকি। ওকি আপনি যে খাচ্ছেন না, খা'ন, খা'ন, ভাল ক'রে খান, লজ্জা করবেন না।" বলিতে বলিলে কর্ত্রী একেবারে এই কক্ষে আসিয়া রমেশচন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। রমেশচন্দ্র আরও ভয়ভক্তি ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। আর সহজ ভাবে এ ব্যঞ্জন লইয়া, সে ব্যঞ্জন লইয়া আহার করিতে পারিতে লাগিলেন না। নিতান্ত মন্ত্র চালিতের ন্যায়, আত্মহারা প্রায়, এটা সেটা লইয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিলেন এবং কখনও কখনও দু'একটা ভাত মুখে দিতে লাগিলেন।

কর্ত্রী তৎদৃষ্টে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন—"ও কি, আপনি যে একেবারেই কিছুই খেতেছেন না, আমি আমার কি আপনার

লজ্জা হয়েছে ? লজ্জা কি ? আমি কি আপনার পর ? আমায় পর মনে করবেন না। আহা, মুখে চোখে যে ঘামিয়ে উঠেছেন। আচ্ছা, আমি এই পাথায় হাওয়া করি, আপনি সুস্থ হয়ে আহার করুন।" এই বলিয়া কর্ত্রী একখান তাল পাখা লইয়া হাওয়া করিতে উদ্যতা হইলেন।

অমনি রমেশ চন্দ্র শশব্যস্তভাবে হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন —"না না, আপনার হাওয়া কত্তে হবে না ; ওঃ আপনার এ অধীনের প্রতি এত স্নেহ ? আমার মাও বোধ হয় আমাকে এত স্নেহ কোন দিন করেন নাই। আপনি পাখা করলে, আমার খাওয়াই অসম্ভব হবে।"

কর্ত্রী অধরে অধরে একটু হাসিয়া কহিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা, আমি পাখা রাখলাম. আপনি ভাল করে খান।"

রমেশচন্দ্র আনত বদনে ভাব বিহ্বল ভাবে ধীরে ধীরে খাইতে লাগিলেন। কর্ত্রী তাঁহাব উজ্জল ললাট ও আরক্ত বদনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"কামিনীর বুকে যবে কাম বহ্নি জ্বলে,
চেতনা থাকেনা তার, উন্মাদিনী প্রায়—
তাহারে ধরিতে চায় বলে কিংবা ছলে,
মজিয়া যাহার রূপে বুক জ্বলে যায়।"

রমেশচন্দ্র আহার সমাপ্ত করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই কর্ত্রী ব্রহ্মময়ী রুদ্ধ কক্ষে শয্যায় পড়িয়া নিমিলিত নেত্রে এক মনে কি ভাবিতেছেন। তাঁহার চোখে রমেশচন্দ্রের নিটোল অঙ্গ সৌষ্ঠব ও নিবিড় পল্লব বিশিষ্ট উজ্জ্বল নয়ন দুটি বড়ই মধুর লাগিয়াছে। তিনি সে মাধুর্য্য মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিতেছেন না। তিনি আবিষ্ট অন্তরে রমেশচন্দ্রের যৌবন সম্পদ চিন্তা করিতেছেন এবং মনে মনে বলিতেছেন—এই অনিন্দ্যশ্রী যুবককে আমার ষ্টেটে রাখিতেই হইবে, ইহাকে আমার হস্তগত করিতেই হইবে। কিন্তু চতুরা বুদ্ধিমতী রমনী ইহাও সহজে বুঝিতে পারিয়াছেন যে শিকারটি অনায়াসে জালে আবদ্ধ হইবে না। তাই মনে মনে নানারূপ কৌশল আলোচনা করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মময়ী রমেশ চন্দ্রের চিন্তায় আত্মহারা, বেলা যে এক রকম অবসান, তাহা তাঁহার জ্ঞান নাই। এখনও তাঁহার মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ। দাসীর কণ্ঠ শ্রুতি গোচর হইল। দাসী বলিল—মা, ম্যানেজার বাবু সাক্ষাৎ করতে এসেছেন।"

কর্ত্রীর চমক ভাঙ্গিল। তাঁহার একটু বিরক্তিও হইল। কুঞ্চিত ললাটে, ধীরে ধীরে শয্যা হইতে উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। দাসী তাঁহার মুখের ভাবে কিঞ্চিৎ ভীত হইল, জিজ্ঞাসা করিল—"মা, অসুখ করেছে?"

"না, ম্যানেজার বাবু কোথায়? তিনি এখন কেন সাক্ষাৎ চান?"

এই সময় ম্যানেজার বাবু স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন। দাসী চলিয়া গেল। কর্ত্রী ও ম্যানেজার বাবু ঘরে প্রবেশ করিয়া কর্ত্রী নিজ পালঙ্ক-প্রান্তে ও ম্যানেজার বাবু অদূরবর্ত্তী একখানা কেদারায় বসিলেন।

কর্ত্রী একটু কি রকম ভাবাপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি দেওয়ান বাবু, এখন কি প্রয়োজনে এসেছেন?"

কণ্ঠস্বর কিছু রুক্ষ ও রস-শূন্য। ম্যানেজার বাবু তাহাতে কিছু বিস্মিত হইলেন, কারণ ইহা স্বাভাবিক নহে, বিশেষ ইতি-পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে আলাপ সম্ভাষণ এইরূপ শুষ্ক ভাষায় হয় নাই। তাই তিনি কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিলেন—"কেন, তোমার কাছে কি প্রয়োজন ব্যতীত আসিতে নাই? তোমার সঙ্গে কি আমার কেবল...

কর্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন—"থামুন। আমার ইচ্ছা নয় যে সব সময় আপনি ভুলে যান, যে আমি আপনার প্রভু; আর আপনি আমার একজন কর্ম্মচারী। আমার এটা পছন্দ না, যে আপনি যখন তখন আমায় এইরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বোধন করেন, কার্য্যের সময় আমার সহিত আমার পদোচিত সম্ভাষণ সম্বোধন করাই বিধেয়।"

ম্যানেজার বাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না তিনি কিছুক্ষণ কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আজ এই নূতন ভাবোদয় কেন? এরূপ ত পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই।

তাঁহার মনে সহসা উদয় হইল—তিনি বোধ হয় কর্ত্রীর অনুগ্রহ হারাইতে বসিয়াছেন, তাঁহার কৃপা দৃষ্টি বোধ হয় আর কাহারও উপর পতিত হইয়াছে। এই কথা মনে উঠিতেই সঙ্গে সঙ্গে রমেশচন্দ্রের উজ্জ্বল নয়ন দুটি তাহার মনে ফুটিয়া উঠিল এবং রোষে ও অভিমানে তাহার মুখ লাল হইয়া গেল।

আত্ম দমন করিয়া কিছু কঠোর কণ্ঠে বলিলেন—"হাঁ, আমার অন্যায় হয়েছে। আমি বুঝতে পারি নাই, যে আমার প্রতিদ্বন্দী জুটেছে। থাক, তবে আমি এখন আসি। যে প্রয়োজনে এসেছিলাম, তা সময়ান্তরে উপযুক্ত কালে বলবো, কি কাগজ পত্রে জানাবো।"

ম্যানেজার বাবু আর রহিলেন না; ইহা বলিয়াই চলিয়া গেলেন। কর্ত্রীর বড় লজ্জা ও ভয় হইল। শত হইলেও মেয়ে মানুষ ত'—তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—বোধ হয় কাজটা ভাল হইল না, বোধ হয় আস্তে ধীরে অগ্রসর হওয়া উচিত ছিল। কি জানি, যদি ইহাঁর আক্রোশে আমার সমস্ত পাপ কথা প্রকাশ পাইয়া যায়, তবে কলঙ্কের সীমা থাকিবে না,—লোক সমাজে মুখ দেখাইতে পারিব না। উপায় কি, উহাঁকে আবার ডাকাইয়া আনিয়া উহার কাছে ক্ষমা চাহিব, আমার অন্যায় হইয়াছে, স্বীকার করিব?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে দম্ভের সঞ্চার

হইল। কি! আমি ক্ষমা চাহিব, কেন? সে কে? আমার একজন ভৃত্য বই ত' নয়? তাহাকে একটু অনুগ্রহ করিতাম বলিয়া কি সে আমার সর্ব্বস্ব, আমার প্রভু? আমি কি তাহার অধীন? অনুগ্রহ করা, না করা ত সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছা। সে আমার কি করিতে পারিবে? সে যদি আমার চাকর হইয়া আমার অনিষ্ট করিতে চায়, তাহাকে বিদায় করিয়া দিব; তাহা হইলেই সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। আর কি ম্যানেজার পাওয়া যাইবে না? রমেশচন্দ্রকে বরং ম্যানেজারী পদ দিব—সে নিশ্চয়ই সে কাজ সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে; সে ত' অনুপযুক্ত নয়।

শয্যায় পড়িয়া ব্রহ্মময়ী এইরূপ এক মনে ভাবিতেছেন ও আলোচনা করিতেছেন, বেলা যে অবসান, তদ্দিকে তাহার হুঁস নাই। সহসা দ্বারে আঘাত হইল। কর্ত্রী বলিলেন—কে? একটি দাসী দরজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিল—"মা, উঠবেন না? বেলা যে গিয়েছে; ঘরের কাজ করতে এসেছি।"

কর্ত্রী আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিলেন। দাসী গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘরে ঝাঁট দেওয়া, শয্যা রচনা করা প্রভৃতি বৈকালিক কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মময়ী সম্মুখের বারান্দায় চিন্তামগ্ন ভাবে পদচারণ করিতে লাগিল। সুসজ্জিত বারান্দা—গালিচায় আচ্ছন্ন, দেয়াল নানাবিধ অতি মনোরম ছবি ও চিত্র দ্বারা ভূষিত; বারান্দার চতুর্দ্দিকে সুগন্ধ পুষ্পের বৃক্ষ ও লতা পুষ্পভারে সমীর স্পর্শে দোলায়মান—এবং বারান্দার গালিচার উপর স্থানে স্থানে কারুকার্য্য মণ্ডিত আস্তরণ যুক্ত কুশিয়ান চেয়ার স্থাপিত। এই মুক্ত বারান্দাই কর্ত্রীর বসিবার ও বিশ্রামের স্থান।

ব্রহ্মময়ী পদচারণ করিতে করিতে একখানা চেয়ারে আসিয়া বসিলেন; বামহস্তের কনিষ্ঠ আঙ্গুলিটি যূথিগুচ্ছের ন্যায় দন্ত দ্বারা মৃদুভাবে চর্ব্বণ করিতে করিতে কি ভাবিতে লাগিলেন। তারপর সেই দাসীকে আহ্বান করিলেন। দাসীর নাম—জয়া। জয়া আসিল। কর্ত্রী বলিলেন—তুই যা, বড় ম্যানেজার ও ছোট ম্যানেজার উভয়কে সংবাদ দে, যেন এখনই আমার সহিত এসে সাক্ষাৎ করেন,—বিশেষ প্রয়োজন।"

জয়া কর্ত্রীকে বড় ভয় করিত। সকল দাসদাসীই করে,—চাকর চাকরাণীর উপর তাঁহার শাসন বড় কড়া।

জয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। কাচারী ঘরে ম্যানেজার, সব ম্যানেজার উভয়ই স্বস্ব কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ম্যানেজার বাবু অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে, কাহারও সহিত কোনও কথাটি না বলিয়া, হাস্য ভাবের শেষ রেখাটি পর্য্যন্ত ওষ্ঠ প্রান্ত হইতে লুপ্ত করিয়া দিয়া কাগজ পত্রাদি দেখিতেছেন ও মধ্যে মধ্যে রক্ত নয়নে সব ম্যানেজারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন।

রমেশচন্দ্র আগামী প্রত্যূষে মফঃস্বল যাইবেন—তাই এদিককার যে সকল কার্য্য অবশিষ্ট আছে, তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তাহার সম্মুখে বহু কাগজ পত্র—তাহা তিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা করিতেছেন, ও তাহাতে মন্তব্য এবং আদেশ লিপি করিতেছেন।

এই সময় জয়া আসিয়া খবর দিল—কর্ত্রী বড় ম্যানেজার বাবু, ছোট ম্যানেজার বাবু উভয়কেই আহ্বান করিয়াছেন। বড় ম্যানেজার ভাবিলেন ব্যাপার কি? রমেশচন্দ্র ভাবিলেন—বোধ হয় জমীদারী সংক্রান্ত কোন জটিল বিষয়ে পরামর্শ আবশ্যক।

উভয়ে কাগজপত্র যথা স্থানে রাখিয়া কর্ত্রীর সহিত দেখা করিতে চলিলেন। বড় ম্যানেজার আগে আগে, তাঁহার পশ্চাতে রমেশচন্দ্র অতি নম্র ভাবে চলিলেন।

কর্ত্রীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই দেখিলেন—কর্ত্রী বারান্দায় বসিয়া আছেন। বড় ম্যানেজার বরাবর অগ্রসর হইলেন। রমেশচন্দ্র সম্ভ্রম ভরে কিছু দূরে রহিলেন।—কর্ত্রীর একেবারে সম্মুখে যাইতে তাঁহার সাহস হইল না; কিংবা তাহা তিনি উচিত মনে করিলেন না।

কর্ত্রী তাহা দেখিলেন। তিনি আপনা হইতেই ডাকিয়া কহিলেন—"ওকি, রমেশবাবু, আপনি অত দূরে রহিলেন কেন? আসুন, এখানে আসুন, আপনাদের সহিত গূঢ় বিষয়ের পরামর্শ আছে।

রমেশচন্দ্র আর কি করিবে? ধীরে ধীরে তথায় আসিলেন। কর্ত্রী উভয়কে দুইখানা চেয়ারে বসিতে বলিলেন। বড় ম্যানেজার বসিলেন, কিন্তু রমেশচন্দ্র বসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। কর্ত্রী বারংবার বলায়, রমেশচন্দ্র সসম্মানে অতি বিনীতভাবে কিঞ্চিৎ দূরে একখানা চেয়ারে বসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

"মায়াবিনী মায়াজাল করিল বিস্তার।
না জানি কেমনে যুবা পাইবে নিস্তার॥"

উভয় ম্যানেজার বসিলেন ; কিন্তু কর্ত্রী সহসা অন্যদিকে ফিরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, কিছুক্ষণ কোন কথাবার্ত্তা হইল না। বড় ম্যানেজারও এতক্ষণ স্থিরভাবে ভ্রূকুঞ্চিত ললাটে কর্ত্রীর কথারম্ভের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন ;—আর স্থির রহিতে পারিলেন না—বলিলেন, আমাদের আহ্বান করেছেন কেন ? কোনও বিশেষ কথা আছে কি ?" কথা দুটী বলার ভাবে একটু শ্লেষের সুর ছিল। যদিও রমেশচন্দ্র তাহা ধরিতে পারিলেন না, ব্রহ্মময়ী ধরিলেন। তাঁহার সুপ্ত অহঙ্কার জাগিয়া উঠিল। ফিরিয়া বলিলেন—হাঁ, কথা আছে ; মনিব আদেশ করিলেই কর্ম্মচারীরা আসিতে ও কথা শুনিতে বাধ্য। থাক্ যে কথার জন্য ডেকেছি। আমি দেখছি, অল্প সময়ের মধ্যে সবম্যানেজার দুই তিন জন এলো, আবার চলে গেল। আমার ষ্টেথের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে ম্যানেজারের পরেই সবম্যানেজারের পদ; তাহার দায়ীত্বও কম নয়। ষ্টেট সংক্রান্ত বহু কার্য্য তাহার উপর নির্ভর করে ; টাকা পয়সাও অনেক তাহার জিম্মায় থাকে। এই অবস্থায় আমার ইচ্ছে না যে একজন আসবে আবার যখন ইচ্ছা হবে পদ ত্যাগ ক'রে চলে যাবে। ইহাতে ষ্টেটের কার্য্যের বহু অসুবিধা ও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। তাই আমার

ইচ্ছা যে রমেশবাবু বেশ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মপটু লোক ব'লে বোধ হচ্ছে, কিন্তু যদি তাঁহার আমার এই কার্য্যে থাকতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহাকে হয় জামিন নতুবা অন্য কোনরূপ এগ্রিমেণ্ট দিতে হবে। অনেক ষ্টেটেই এইরূপ ব্যবস্থা আছে—আমিও তাহা প্রচলিত করতে চাই।"

বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন, ধূর্ত্ত কৈলাস বাবুর বুঝিতে বাকী রহিল না—ব্রহ্মময়ীর অন্তরের নিহিত উদ্দেশ্য কি? তিনি ঈষৎ বক্রভাবে হাসিয়া বলিলেন—"হাঁ, অনেক ষ্টেটে এরূপ নিয়ম আছে সত্য, তবে আপনার ষ্টেটে কোন কালেই সবম্যানেজারের পক্ষে জামিন বা এগ্রিমেণ্ট দিতে হতো না: কারণ ম্যানেজারই যথেষ্ট জামিন দেয়—আমিও দিয়েছি। আপনার ষ্টেট এমন কিছু বড় নয়—এক ম্যানেজারের উপরই সম্পূর্ণ দায়ীত্ব থাকে এবং এক ম্যানেজারই মনোযোগপূর্ব্বক কার্য্য করলে আপনার ষ্টেটের সমস্ত ভার বহন করতে পারে। সবম্যানেজার প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণ তাহার সহায়তাকারী মাত্র।

কর্ত্রী বলিলেন—'তা যেরূপই হউক, এখন আমার মতে তা আর চলে না। এখন লোকের আকাঙ্ক্ষা বেশী, কাজেই আমাদের নিরাপদ থাকতে হ'লে তদ্রূপ করা আবশ্যক।

'আকাঙ্খা বেশী' কথাটা শুনিয়া রমেশচন্দ্র একটু বিচলিত হইলেন। বলিলেন—আকাঙ্ক্ষা বেশী? তবে সেরূপ...

কর্ত্রী বুঝিলেন—কথাটায় রমেশচন্দ্র আহত হইয়াছেন। তাই বাধা দিয়া কহিলেন—"না, রমেশবাবু, আপনি যে অর্থে নিয়েছেন, আমি সে অর্থে বলি নাই। আমার বলার অর্থ— যে এখন লোকের অভিলাষ উচ্চ—অল্পে তুষ্ট থাকে না, অল্প

স্থানে কিছু সুবিধা পেলেই চাকরী ছেড়ে চ'লে যায়, পূর্ব্ব মনিবের প্রতি ফিরেও চায় না।

এই কথা বলিয়াই কর্ত্রী নিজের মনে মনে একটু না হাসিয়া পারিলেন না। কৈলাসবাবু বলিলেন—"তা যাবে না? উপযুক্ত লোক কি সারা জীবনটা এই ৭৫৲ কি ১০০৲ টাকা মাইনের কাজে পড়ে থাকবে, আপনার নিজের উন্নতি দেখবে না? যাদের বিদ্যা ও শক্তি আছে, তারা কখনও উচ্চাভিলাষী না হ'য়ে পারে না।"

"কেন, আমার ষ্টেটে কি উন্নতির আশা নাই? বিশ্বস্ত ও কর্ম্মদক্ষ কর্ম্মচারী হ'লে, কালে ত' ম্যানেজারী পদও পেতে পারে। আমি কি ম্যানেজারকে কম দেই? ২৫০৲ টাকা মাসে অনেক বড় ষ্টেটের ম্যানেজারও পায় না।

ম্যানেজার বাবু বলিলেন—"হাঁ, তাতো আশা আছেই। বিশেষ আমিও ক্রমে যখন অযোগ্য হয়ে পড়ছি। তা বেশ, যদি রমেশবাবু জামিন বা এগ্রিমেণ্ট দিতে রাজী থাকেন, দিবেন, আমার আর আপত্তি কি?

কর্ত্রী তখন রমেশচন্দ্রের প্রতি নয়ন ফিরাইয়া কহিলেন—হাঁ, রমেশবাবু, আমার ইচ্ছা, আপনি হয় জামিন, না হয় এগ্রিমেণ্ট দিন, নতুবা আমি বিশ্বাস পাই না।"

স্বর নিতান্ত কোমল।

রমেশচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরবে ভাবিয়া বলিলেন—"আমি যখন আপনার চাকরী গ্রহণ করেছি, তখন আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য; কিন্তু আমি এখানে সেইরূপ উপযুক্ত জামিন দিতে সক্ষম হব না, কারণ আমি বিদেশী। আমি এগ্রিমেণ্ট দিতে

রাজী আছি, যেহেতু আমার কথা এক; আপনার ষ্টেট ক্ষতি ক'রে অথবা আপনার বিনা অনুমতিতে আমি কথনই এ কায ত্যাগ করে যাব না, অন্য জায়গায় পাঁচশ টাকা পেলেও, না। তখন আর আমার এগ্রিমেণ্ট দিতে ভয় কি? আর আমার এমন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাও নাই। আমি বিনা চিন্তায়, খেয়ে পরে থাকতে পারলেই তুষ্ট।

কর্ত্রী কহিলেন—"বেশ কথা, এগ্রিমেণ্ট দিলেই হবে। আমি জামিন চাই না। তবে আর বিলম্ব না ক'রে কা'লই একটা ২০০০৲ টাকার এগ্রিমেণ্ট লিখে পড়ে রেজিষ্টারী করিয়ে দিবেন। সর্ত্ত থাকবে যে আমার বিনা অনুমতিতে চাকরী ত্যাগ করে গেলে, ঐ টাকার পরিমাণ ক্ষতির দায়ী হবেন।

কৈলাসবাবু চমকিত স্বরে বলিলেন "দুই হাজার টাকা!"

কর্ত্রী বলিলেন—"হঁা, দুই হাজার টাকা!

রমেশচন্দ্র কহিলেন—"দুই হাজার হউক, আর পাঁচ হাজার হউক, আমার কিছুমাত্র ভয় নাই। সর্ত্ত ভাঙ্গলে ত ক্ষতির দায়ী হব—নইলে ত নয়? তবে আর ভয় কি?

কৈলাসবাবু ভাবিলেন—যুবকটি মজিয়াছে, মায়াবিনীর জালে পড়িয়াছে।

কর্ত্রী কহিলেন—'তবে আগামী কা'লই দলিলটা সম্পাদন করে দিবেন।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—'আমি ত' কাল প্রত্যূষে মফঃস্বল যাবার বন্দোবস্ত করেছি। ফিরে এসে দিলে কি চলবে না?

"না, কার্য্য আরম্ভ করার পূর্ব্বেই ভাল।"

"তবে আচ্ছা, কাল দলিলটে সম্পাদন করে দিব ; পরন্তু বরং মফঃস্বল যাব।"

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। ক্রমে ছায়া গাঢ় হইয়া আসিতেছে। দাসী বাতি লইয়া আসিল। উভয় ম্যানেজার তখন আর বিলম্ব না করিয়া কর্ত্রীকে যথাযথ অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন ;

দশম পরিচ্ছেদ।

"আমি—করেছি বিষম ভুল।
এখন—কেমনে পাইব কূল ?"

বাসায় ফিরিয়া রমেশচন্দ্র এই সকল বিষয় জ্ঞাপন করিয়া সুনীতিকে এক বিস্তৃত পত্র লিখিলেন ; এবং সেই দিনের ডাকে প্রিয়তমার যে পত্র পাইয়াছেন, যদিও তাহা অনেকবার পাঠ করিয়াছেন, আবার পড়িলেন এবং পড়িতে পড়িতে তাহাকে এখানে আনাপক্ষে কেবলই বিলম্ব পড়িয়া যাইতেছে, ভাবিয়া একটু দুঃখিত হইলেন।

পরদিন যথাসময়ে এগ্রিমেণ্ট দলিল সম্পাদিত ও রেজেষ্টারী হইয়া গেল। রমেশচন্দ্র দলিল দিয়া বাসায় ফিরিলেন এবং যথাযথ লিখিয়া সুনীতিকে জানাইলেন।

পত্র লিখিয়া আহার শেষ করিয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সহজে ঘুম আসিতে লাগিল না। সুনীতির কথা প্রাণে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন অবধি সুনীতি হইতে বিচ্ছিন্ন—বহু দিন অবধি প্রেয়সীর মধুমাখা কথা শুনেন নাই, অনেক দিন যাবৎ তাঁহার সঙ্গ সুখে বঞ্চিত ; দুঃখে প্রাণ ভরিয়া গেল। রমেশচন্দ্র বিছানায় পড়িয়া আকুল ভাবে পত্নীর মুখশশী চিন্তা করিতে লাগিলেন। চিন্তা করিতে করিতে অদ্যকার দলিল দেওয়ার কথা মনে পড়িল। হঠাৎ মনটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। একটা যেন কি আশঙ্কা তাঁহার প্রশান্ত হৃদয়ে একখানা কালো মেঘ

ছড়াইয়া দিল। তাঁহার এ যাবৎ কোন আশঙ্কা কি চিন্তা হৃদয়ের কোন অংশে ছিল না, কিন্তু সহসা না জানি কেন একটা ভাবনা ও শঙ্কার ঘন ছায়া হৃদয় ফলকে পতিত হইল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল বুঝি কাজটা ভাল করি নাই, ২০০০৲ টাকার এগ্রিমেণ্ট ত সহজ নয়,—এত গুলি টাকার দায় ইচ্ছা করিয়া ঘাড়ে চাপাইয়া লইলাম,—একেবারে এই ষ্টেটের কেনা গোলাম হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা মত আর যাইতে থাকিতে পারিব না—জমিদারীণীর একেবারে করায়ত্ত হইলাম।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে বড় একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। আর শয়ন করিয়া থাকিতে পারিলেন না,—উঠিয়া বসিলেন—বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কাজটা বুঝি বড়ই অন্যায় করিয়া বসিয়াছি, তার পূর্ব্বে কেন এ সব ভাবনা হৃদয়ে আসিল না—হায়, তায় কি ভুলই, জানি, করিয়া বসিলাম,—হায়, আজ যদি সুনীতি নিকটে থাকিত, তবে বোধ হয় এ ভুল করিতে পারিতাম না—তাঁহার বুদ্ধির সীমা নাই, সে কখনই আমায় এইরূপে পরের ক্রীত দাস হইতে দিত না—হায়, সুনীতির পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া এ কাজটা করিলাম কেন?

রমেশচন্দ্র বড়ই অস্থির হইয়া উঠিলেন—তাঁহার নয়ন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল—ওষ্ঠপ্রান্ত কাঁপিতে লাগিল—কিছুক্ষণ তিনি নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হঠাৎ তাঁহার হৃদয়ে সুনীতির হাসিমাখা মুখখানি ভাসিয়া উঠিল—যেন ঘোর ঘটা-সমাচ্ছন্ন আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইল। অচিরে রমেশচন্দ্রের হৃদয়ের অন্ধকার কাটিয়া গেল। তাঁহার মনে হইল—আমার এত ভয় বা চিন্তা কেন? আমি আর কি চাই? আমার জীবনের

প্রধান আকাঙ্ক্ষা যে—আমি ও আমার সুনীতি যেন মোটা ভাত খাইয়া ও মোটা কাপড় পরিয়া নিশ্চিন্তে পরস্পরের সুখ সম্মিলনে জীবন যাপন করিতে পারি। অন্য উচ্চ আশা ত' আমাদের নাই। তবে আর চিন্তা কি? আমার এই ষ্টেটের চাকুরী ত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? আমি এস্থানে যাহা পাইতেছি, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট—তদ্দারা আমরা বেশ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে দিন অতিবাহিত করিতে পারিব। তবে আর ভয় কি? সততা ও নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য করিয়া যাইব—তাহা হইলে আমার আর জমিদারিণী কি করিবেন?

এইরূপ চিন্তায় তাঁহার মনে একটা শান্তি আসিল, প্রাণটা বহুল পরিমাণে সুস্থতা লাভ করিল। রমেশচন্দ্র আবার শয্যা লইলেন—এমন সময়—'রমেশ বাবু, ঘুমিয়েছেন?' কে যেন বাহির হইতে দরজার কড়া নাড়া দিয়া ডাকিয়া বলিলেন। 'কে?' বলিয়া রমেশচন্দ্র উঠিয়া দরজা খুলিলেন এবং বড় ম্যানেজারকে দেখিয়া বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন—"বড় বাবু যে, এত রাত্রিতে কেন?" "আপনি এখনও ঘুমান নি? কিছু বিশেষ কথা আছে তাই এসেছি" বলিয়া বড় ম্যানেজার রমেশ-চন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিলেন। এবং রমেশচন্দ্রের বিছানার এক ভাগে বসিয়া ধীর কণ্ঠে বলিলেন—'রমেশ বাবু, আপনিও বসুন, বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা আছে"

রমেশচন্দ্র কিছু ভীত ও চিন্তিত হইয়া বসিলেন।

বড় ম্যানেজার কহিতে লাগিলেন—'রমেশবাবু, আপনি কি বুঝে দেখেছেন, আপনা হ'তে এ দলিল নেওয়া হলো কেন?

কত সব-ম্যানেজার এ ষ্টেটে এল, চলে গেল—কৈ, আর কারও নিকট ত' এরূপ দলিল চাওয়া হয় নাই ?

রমেশচন্দ্র ধীরস্বরে বলিলেন—'না, আমি এমন বিশেষ কিছু বুঝতে চেষ্টা করি নাই। তবে আমার বিশ্বাস, এইরূপে বহু সব-ম্যানেজার আসেন আর যান ব'লেই আমার নিকট হ'তে এই এগ্রিমেণ্ট নেওয়া হলো, যাতে আমিও আবার সুবিধা মত চলে না যাই”

বড় ম্যানেজার কহিলেন—হাঁ, কথাটা প্রথমতঃ সেরূপই বোধ হয়। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটা তদ্রূপ নয়। জ্ঞানে, বুদ্ধিতে যেরূপই হউক, বয়সে আপনি এখনও এক রকম তরুণ যুবক। বিশেষ আমি এই ষ্টেটে আজ ১৫।১৬ বৎসর যাবৎ কাজ করছি—জমিদারিনীর অন্তর বাহির আমার অজ্ঞাত নাই। আমার বিশ্বাস—আপনি কাজটা বড় ভাল করেন নাই একটু বুঝে শুনে দলিলটা দেওয়া উচিত ছিল। কার মনে কি ফন্দী আছে, সহজে ধরা যায় না।

রমেশচন্দ্রের পূর্ব্বের চিন্তা ও ভয় আবার জাগিয়া উঠিল। তিনি কিছু চঞ্চল হইয়া বলিলেন—“হাঁ, আমার মনেও কিছু ক্ষণ হলো সেই চিন্তা উঠেছিল। সেই চিন্তায়ই আমার এতক্ষণ ঘুম আসে নাই। তবে, বড় বাবু, আমাকে একথা পূর্ব্বে বলেন নি কেন? কাল একথা বললে বা ঘুণাক্ষরেও একটু ইঙ্গিত দিলে ত' আমি সতর্ক হ'তে পারতাম।

বড় ম্যানেজার—না সে কথা কা'ল হয়তো বললে, আপনি ভাবতেন—কর্ত্রী আমাকে স্নেহ করেন, কালে বড় ম্যানেজার

হ'তে পারবো, আশা দিয়েছেন এই জন্য বুঝি ইনি হিংসায় এরূপ পরামর্শ দিচ্ছেন।

রমেশচন্দ্র—তবে আজ বলায় আমার কি উপকার হলো? আমি এখন আর কি করতে পারি?

বড় ম্যানেজার—'তা সত্য, দলিল যখন হয়ে গেছে, তখন সম্প্রতি বিশেষ কিছু উপায় নাই। তবে আপনার এখন হ'তে খুব সাবধান হ'য়ে চলতে হবে। আমার এখন আসার উদ্দেশ্যই—আপনাকে সাবধান ক'রে দিতে। আপনি এখনও সংসার ভাল চেনেন নাই—তাই বলছি জমিদারিনীর মতলব বড় সাধু নয়; আপনি খুব সতর্ক হয়ে থাকবেন, আর যদি সম্ভব হয়, অনতি বিলম্বে আপনার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে আসুন। আমি এখন যাই—এ সময় আমার এখানে অধিকক্ষণ থাকা ভাল নয়—প্রকাশ হ'লে—আমরা উভয়ই কর্ত্রীর অপ্রীতি-ভাজন হ'তে পারি। আমি যাই—আপনাকে সৎ পরামর্শ দিলাম—দেখবেন, এ কথা যেন প্রকাশ পায় না।"

বড় ম্যানেজার দ্রুতপদে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। রমেশ-চন্দ্র হতবুদ্ধির মত মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"প্রেমিকের জয় যথা তথা।
প্রেমের গৌরবে, কুচক্রীও শেষে
লজ্জাপেয়ে নত করে মাথা॥"

পরদিন প্রাতে রমেশচন্দ্র মফঃস্বল চলিয়া গেলেন। সঙ্গে এক পশ্চিম দেশীয় দরোয়ান গেল। তাহার নাম রামভজন। রামভজন জাতিতে ক্ষত্রিয়। সে বৃদ্ধ না হইলেও, প্রায় বৃদ্ধ বলা যায়। তাহাব বয়স প্রায় পঞ্চাশ পঞ্চান্ন হইবে—তবে খুব স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ শরীর, তাই বয়স ঠিক ধরা যায় না। লোকটী কর্ত্রীর নিতান্ত অনুগত ও খুব বিশ্বাসের পাত্র, বহু বৎসর অবধি এই ষ্টেটে আছে, বাড়ী ঘরে কে আছে, বিশেষ জানা যায় নাই—সে বাড়ীঘর বড় যায় না; এখানে থাকিয়াই সন্তুষ্ট চিত্তে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে ও প্রাতে সন্ধ্যায় প্রাণ ভরিয়া একটি একতারা সহযোগে রামনাম কীর্ত্তন করে। আর লোকে বলে—তাহার আশে পাশে নাকি একটি নেশার পাত্রী আছে, সেখানেও কখন কখন যায়।

সব ম্যানেজার মফঃস্বল যখন যান, ষ্টেট্ হইতে একটি দরোয়ান সমভিব্যাহারে যাইয়া থাকে—ইহাই প্রচলিত নিয়ম। তাই কর্ত্রীর আদেশে এইবারে রামভজন রমেশচন্দ্রের সঙ্গে গেল। রামভজন বড় চতুর লোক; তাহার প্রতি কর্ত্রীর বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাস। যাইবার পূর্ব্বে কর্ত্রী তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া

লইয়া গিয়াছিলেন এবং উভয়ে বহুক্ষণ নিরালায় কথাবার্ত্তা হইয়াছিল।

মফঃস্বলে পৌছিয়া রামভজন রমেশচন্দ্রের যৎপরোনাস্তি সেবা যত্ন করিতে লাগিল। তাঁহার আহারে বিহারে যাহাতে কিছুমাত্র অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি রামভজন বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই রামভজনের উপর নিরতিশয় তুষ্ট হইলেন এবং সর্ব্ব বিষয়ে তাহার উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে এইরূপ হইয়া দাঁড়াইল যে—রামভজন যে একজন দরোয়ান—ভৃত্যমাত্র,—তাহা প্রায় ভুলিয়া গেলেন, তাহাকে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী অভিভাবক, নিতান্ত স্নেহশীল বান্ধবস্বরূপ জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

এইরূপ অনেকদিন হইতে লাগিল—যে কোন কারণে রমেশ চন্দ্রের মন খারাপ বোধ হইলে, চিত্তে শান্তি না পাইলে, তিনি রামভজনকে নিকটে ডাকিয়া তাহার সঙ্গে বসিয়া নানাবিধ আলাপ করিয়া মনের অশান্তিভার লঘু করিতে চেষ্টা করিতেন।

দুইদিন পর্য্যন্ত সুনীতির চিঠি পাওয়া যায় নাই—তাই আজ রমেশের প্রাণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। কা'ল অবধি চিন্তিত ও ব্যাকুল ছিলেন। আজ নিশ্চয়ই চিঠি পাইবেন ভরসায় প্রাণকে আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিলেন। আজ যখন প্রাতে পোষ্ট আফিস হইতে রামভজন শূন্যহাতে ফিরিয়া আসিল, তখন রমেশচন্দ্র চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তাহার যেন সকল দিক শূন্য বোধ হইতে লাগিল। আজ তিনি ভাল করিয়া স্নানাহার করেন নাই—যাহা কিছু করিলেন, বা—না করিয়া পারিলেন না, তাহা শুধু রামভজনের পীড়াপীড়িতে। আজ তিনি কোন কাজ

কর্ম্মে মন দিতে সক্ষম হয়েন নাই—তাহার প্রাণ আজ একরকম ছটফট করিতেছে। কি যে করিবেন ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছেন না। একবার ভাবিতেছেন টেলিগ্রাফ করিবেন, কিন্তু টেলিগ্রাফ আফিস কাছে নাই—প্রায় দুই প্রহরের পথ দূরে। তথাপি তথায় লোক পাঠাইয়া টেলিগ্রাফ করিবেন, ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও লাভ নাই, কারণ রমেশচন্দ্রের শ্বশুরালয় যে গ্রামে, সেও একটি পল্লীগ্রাম—টেলিগ্রাফ আফিস নাই—তথা হইতে টেলিগ্রাফ আফিস বহুদূরে। ডাকে দেড়দিনে টেলিগ্রাম সেই গ্রামে পৌঁছে। কাজেই, টেলিগ্রাফ করিয়া উত্তর পাইতে যে সময়, চিঠিতেও প্রায় সেই সময় লাগিবে। তাই টেলিগ্রাফ না করিয়া রমেশচন্দ্র নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে এক বিস্তৃত পত্র লিখিয়া রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া এক্ষণে অস্থির চিত্তে আগামী কালের ডাকের প্রতিক্ষায় রহিয়াছেন।

সন্ধ্যাকাল—আকাশে ভুবনে দিবালোক নির্ব্বাপিত হইয়া সন্ধ্যার ঘন ছায়া চতুর্দ্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়াছে; রমেশচন্দ্র তবুও গৃহের বাহির হয়েন নাই, নিরতিশয় বিষণ্ণ ও ব্যাকুল ভাবে শয্যায় পড়িয়া স্ত্রীর একখানা পত্র হাতে করিয়া কি ভাবিতেছেন।

এমন সময় রামভজন ঘরে প্রবেশ করিয়া তক্তাপোষের পার্শ্বে একখানা ছোট টুলে বসিল। বসিয়া রমেশচন্দ্রকে বিবিধ রকমে বুঝাইতে লাগিল।

রামভজন বলিল—'বাবু', আপনি একই দিনেই কেমন হইয়া গিয়াছেন। আপনি এমন চিন্তা করিতেছেন কেন? আমার পরিবার ছিল, সাত আট মাস পর চিঠি ভেজতাম, দশমাসে পনের

মাসে উত্তর পাইতাম—কৈ, বাবু আমার ত, এমন চিন্তা হইত না।

রমেশচন্দ্র অন্য মনে বলিলেন—তোমার চিন্তা হ'তো না, তুমি সুখী ছিলে; কিন্তু আমার তাহা হয়, তাই বড় দুঃখী।

এই বলিয়া আবার শূন্য অন্তরে কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রামভজন কিছুক্ষণ কিছু না বলিয়া রমেশচন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে একটু হাসিয়া বলিল—বাবু, আপনি বড় বহু পাগলা আছেন; বহু চিঠি লিখিছে না, তাতেই এত চিন্তা; বহুর ব্যারাম ট্যারাম কিংবা আর কিছু হইলে, আপনি কি করিবেন?

এই কথায় রমেশচন্দ্রের কর্ণকুহরে যেন কেহ তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিল। রমেশচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় শয্যা হইতে উঠিয়া রামভজনের হাত ধারণ করিয়া বলিলেন -

"রামভজন, রামভজন, ওকথা ব'লো না। আমার সুনীতির কিছু হ'লে আমি বাঁচবো না—আমার সকল সংসার শূন্য হ'য়ে যাবে—আমি পাগল হ'য়ে শ্মশানে যাব।

রমেশচন্দ্রের কথায় ও তাহার মানসিক অবস্থায় রামভজনের কঠিন নীরস হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল। সে আর হাসিয়া কথা কহিতে পারিল না। সে কোমল ব্যথাপূর্ণ বচনে কহিল তবে বাবু আপনি সত্য সত্যই আপনার বউকে খুব ভাল বাসেন!

রমেশচন্দ্র অতিশয় চাঞ্চল্যের সহিত বলিলেন—হাঁ, হাঁ, রামভজন, আমি খুব ভাল বাসি—সে আমার পরিণীতা স্ত্রী, তাকে ভালবাসা,—প্রাণ দিয়া ভাল বাসা যে আমার কর্ত্তব্য, আমার ধর্ম্ম! আমার সুনীতি আদর্শপত্নী—আমি ভাগ্যবান্—আমি

ভাগ্যবান্; রামভজন, তুমি বৃদ্ধ, ক্ষত্রিয়, তুমি আশীর্ব্বাদ কর— আমার সুনীতির যেন কিছু হয় না, আমার সুনীতি যেন আমাকে ছেড়ে না যায়; তা হ'লে আমি বাঁচবো না, তা হ'লে আমি ম'রে যাব!

রামভজন আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার অন্তরতলে অনুতাপ শিখা ধপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল হায়, হায়, আমি এক রাক্ষসীর মন্ত্রণায় এমন স্বর্গীয় প্রেমের অধিকারী, দেবোপম হৃদয়বান্ যুবকের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি। ছিঃ ছিঃ আমি কি জঘন্য, কি অধম!

নিজের প্রতি তাহার ধিক্কার জন্মিল। লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিল—রমেশবাবু, আপনি দেবতা আছেন, আজথেকে আমি আপনার দাস, আপনার বাহন; আপনি আর ভাবনা করিবেন না, মার চিঠি আমি কা'ল আপনার হাতে পৌছাইয়া দিয়া অন্ন স্পর্শ করিব তৎপূর্ব্বে করিবো না, এই আমার শপথ।

এই বলিয়া দ্রুতগতিতে উন্মত্তের ন্যায় রামভজন ঘরের বাহির হইয়া গেল। রমেশচন্দ্র রামভজনের এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তণে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতে লাগিল—এ আবার কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

"যখন হৃদয়ে জাগে সত্য অনুতাপ
ধৌত হয়ে যায় সব পূর্ব্বকৃত পাপ"

সে রাত্রে রামভজন আর রমেশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিল না। সে কিছু আহারও করিল না—একেবারে আপন কক্ষে যাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার নয়ন ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল—তাহার ঘুম আসিল না—সে ভাবিতে লাগিল—"হায়, হায়, আমি কি পশুর ন্যায় কাজ করিয়াছি, এমন দেবতার মত মানুষের প্রাণে ব্যথা দিয়াছি। হায়, কেন আমি চিঠিগুলি গোপন করিয়াছি, কেন মায়াবিনী, দুশ্চারিণী কর্ত্রীর কথা শুনিয়াছি? সেই দুশ্চারিণীর বশীভূত হইয়া বহু অন্যায় কার্য্য করিয়াছি—অনেক গুপ্ত মন্ত্রণায় সহায়তা করিয়াছি, কিন্তু এমন চরিত্রবান, হৃদয়বান পুরুষের সহিত সংঘর্ষণে ত আর কখনও আসি নাই। কি চরিত্র! কি হৃদয়! আমি যে এমন পশুপ্রকৃতি, অশিক্ষিত লোক—আমারও প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে। যেমন আমার ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র মাতা সীতা দেবীর বিরহে পাগল হইয়াছিলেন ইনিও দেখি সেইরূপ হইয়াছেন। এই ত' খাঁটি পত্নীপ্রেম—এইতো বিশুদ্ধ স্বর্গীয় প্রেম! হায়, হায়, এই প্রেমে বাদ সাধিতেছি—এইরূপ প্রেমপূর্ণ জীবনের আমি শত্রু হইতেছি; ছিঃ ছিঃ কি জঘন্য কার্য্য করিয়াছি!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়ে প্রচণ্ড অনুতাপ শিখা জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই আগুনে সে সমস্ত রজনী পুড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

প্রাতে উঠিয়াই রাম রাম করিতে করিতে পোষ্ট আফিস দিকে ধাবিত হইল। সে মনে মনে কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল—"হে রামচন্দ্র, হে রঘুবীর, আজ যেন মা'র, বাবুর স্ত্রীর একখানা পত্র পাই, তাহা হইলে এই পত্র সহ অন্য পত্রগুলি বাবুর হাতে দিয়া বাবুর পায়ে লুটাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে পারি—দোহাই রঘুনাথজী, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও।'

এইরূপ ভাবে জগদীশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতে রামভজন দুই মাইল পথ উর্দ্ধশ্বাসে দ্রুত হাঁটিয়া আসিয়া পোষ্ট আফিসে পৌছিল। পোষ্ট আফিসে তখন মাষ্টার বাবু আসেন নাই। একটি মাত্র পিওন রকম লোক ছিল। রামভজন যেন নিতান্ত ব্যস্ত—এইরূপ ভাবে সেই লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিল—'মাষ্টার বাবু কোথায়? সবম্যানেজার বাবুর কি কোন চিঠি এসেছে?" পিওনটি কিছু উগ্র স্বভাবের লোক ছিল; অমায়িকতা কি সহানুভূতি বলিয়া বস্তুটি তাহার চারিপাশে নাই। ঐরূপ চরিত্রের ব্যক্তি রেল কি ষ্টিমার ষ্টেশনে নিযুক্ত হওয়া উচিত ছিল। ভগবানের অনন্ত কৃপায়, তাহার কপালে বোধ হয় লোকের অভিসম্পাত পাওয়া কিছু কম ছিল, তাই সে রেল কি ষ্টিমার আফিসে চাকরী না পাইয়া পোষ্ট আফিসে পাইয়াছে। সে যাহাই হউক পিওনটি রাম-ভজনের প্রশ্নের দুই তিন বার উত্তর না দিয়া অবশেষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া, অত্যন্ত বিরক্তিসূচক কণ্ঠে বলিল—"মাষ্টার বাবু এখনও

আসেন নাই ; ম্যানেজাব বাবুর চিঠি এখন আসবে কোত্থেকে ? ডাক কি এসেছে ?” এই বলিয়া লোকটি আর রামভজনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না কবিয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল। রামভজন আর কি কবিবে—একদিকে সরিয়া যাইয়া স্থিবভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। পিওনের ধমক খাইয়া তাহাব বক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল—জমিদাবেব লোক,—যাব তার মুখে এ বকম ধমক খাওয়া তাহাব অভ্যাস নাই, তাই তাহাব চোখ প্রায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল—তবে এইটা সবকারী আফিস, এখানে তাহাদের কোন জোব নাই, আব বিশেষ এক্ষণে তাহাব মনের অবস্থাও ভাল ছিল না, তাই রামভজন নিজেকে সামলাইয়া লইল এবং আফিস. ঘবেব এক পার্শ্বে স্থিবভাবে দাঁড়াইয়া ডাকেব অপেক্ষায় বহিল।

কিছুক্ষণ পবে ডাক বাহকেব ঘুঙুরের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। ডাক বাহক ঝুনুব ঝুনুব করিতে করিতে ডাকের ব্যাগ মাথায় বহন করিয়া অর্দ্ধদৌড় পদ বিক্ষেপে পথ অতিক্রম কবিয়া আসিয়া আফিস ঘরে প্রবেশ কবিল এবং মস্তক হইতে ডাকের ব্যাগটি ধপাত' করিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া স্কন্ধস্থিত গামোছা গামছা লইয়া আপনার অঙ্গে বায়ু করিয়া। নিজের ক্লান্ত শরীর শীতল করিতে লাগিল।

রামভজন উৎসুক হইয়া দবজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং কখন ব্যাগ খুলিয়া চিঠি বাহির করে, তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

প্রতিক্ষণ তাহার নিকট যুগসম দীর্ঘ বলিয়া বোধ

হইতে লাগিল। আধ ঘণ্টা প্রায় কাটিয়া গেল; তবুও মাষ্টার বাবু আসিতেছেন না, ব্যাগও খোলা হইতেছে না।

অবশেষে মাষ্টার বাবু আসিলেন। আপনার অন্যান্য কাজ দেখিয়া শুনিয়া ব্যাগ খুলিতে আদেশ দিলেন।

ব্যাগ খুলিয়া সকল চিঠি ও পার্শ্বেল বাহির করা হইল। পত্রবাছনকারী পিওনগণ পত্র সকল বাছিতে লাগিল।

এক এক ভাগে অনেক চিঠি জমিল। এই সময় রামভজন আর স্থির হইয়া থাকিতে অক্ষম হইয়া মাষ্টার বাবুর নিকট যাইয়া বলিল—'বাবু, আমাদের ম্যানেজার বাবুর নামে কোন চিঠি আসিয়াছে?

মাষ্টার বাবু ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি রামভজনের কথায় তাহার প্রতি দৃকপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কোন ম্যানেজার বাবুর?

রামভজন কহিল—'রমেশ বাবু'। পোষ্ট মাষ্টার বাবু বুঝিলেন, বলিলেন—'ও বুঝেছি।' তখন তিনি ডাকিয়া বলিলেন—'আহে দেখ ত' রমেশ বাবু সবম্যানেজারের নামে কোন্ চিঠি আছে কি না?"

একজন পিওন উত্তরে বলিল—'আজ্ঞে, হাঁ ম্যানেজার বাবুর নামে এক খানা চিঠি আছে, 'এই সেই চিঠি।' এই বলিয়া চিঠি দুইখানা সেই পিওনটি মাষ্টার বাবুর নিকট আনিয়া দিল। মাষ্টার বাবু তাহা দেখিয়া রামভজনকে জিজ্ঞসা করিলেন—'তুমি কি ম্যানেজার বাবুর লোক?"

রামভজন কহিল—'হাঁ, বাবু, আমি তাঁর চিঠি রোজ নিয়ে যাই।

মাষ্টার বাবু বলিলেন—'তবে এই চিঠি নেও ; এই তাঁহার এক'খানা চিঠি আছে, তাকে দিও।"

রামভজন যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল ; এইরূপ আনন্দ উল্লাসে চিঠিখানা হাতে লইয়া পোষ্ট মাষ্টার বাবুকে অভিবাদন করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে বাসা অভিমুখে ধাবিত হইল।

বাসার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিল—রমেশচন্দ্র নিরতিশয় উতলাভাবে বাসার বহির্ভাগে আসিয়া পথের দিকে তাকাইয়া আছেন। বামভজন আরও কিছু নিকটবর্ত্তী হইতেই রমেশচন্দ্র তাহার হস্তস্থিত পত্র দেখিলেন এবং উচ্চস্বরে উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন—"ও কি ? চিঠি ? দেখি দেখি কার চিঠি ?"

রামভজন কিন্তু তাঁহার কথার উত্তব না দিয়া অন্য পথে দ্রুত পদে বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন কক্ষে গেল এবং নিজের শয্যার তল হইতে কতকগুলি পত্র লইয়া সবেগে বাহির হইল। ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্র রামভজনের কাণ্ডে কিছু চিন্তিত ও কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া চঞ্চল গতিতে রামভজনের খোঁজে ঐ ঘরের দিকে আসিতেছিলেন—এমন সময় রামভজন সমস্ত পত্র লইয়া —"বাবু, এই মা'র পত্র নিন,—আমায় ক্ষমা করুন, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই—এই বলিয়া সমস্ত চিঠি রমেশ-চন্দ্রের হাতে অর্পণ করিয়া তাহার পায়ের উপব লুটাইয়া পড়িল ?

রমেশচন্দ্র আগ্রহ সহকারে চিঠিগুলি লইয়া এবং তাহাতে

সুনীতির হস্তাক্ষর দেখিয়া দ্রুতপদে আপনার ঘরে ছুটিয়া গেলেন। রামভজন কেন ক্ষমা চাহিল, কেন পায়ে লুটাইয়া পড়িল, তাহার কি অপরাধ—তাহা তখন আর ভাবিবার কি খোঁজ করিবার তাহার কোন অবসর ছিল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

"পিতা যবে পায় পুত্র
প্রথম, জীবনে
নাচে তার হিয়াতল
অপূর্ব্ব স্পন্দনে"

রমেশচন্দ্র দ্রুতগতিতে আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পত্রগুলি সম্মুখে রাখিয়া বসিলেন এবং কোন পত্র কাহার, কোথা হইতে আসিল, তাহা দেখিবার পূর্ব্বে ইষ্টদেবতার উদ্দেশ্যে কয়েকবার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম করিলেন। তাহার হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে, সংশয় শঙ্কায় কাঁপিতেছে। প্রথম শঙ্কা এই পত্রগুলির মধ্যে সুনীতির পত্র আছে কিনা? দ্বিতীয় শঙ্কা যদিও থাকে, তাহাতে সুসংবাদ আছে কিনা? এত দীর্ঘকাল পরে চিঠি পাইয়াছে—তাই আশঙ্কা সে নিশ্চয়ই কিছু অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে, নতুবা এতদিন পরে চিঠি আসিল কেন?

রমেশচন্দ্র এখনও বুঝেন নাই যে এই চিঠিগুলি আজ একদিনেই সব আসে নাই। তাঁহার বিশ্বাস—রামভজন ঐ সমস্ত পত্রই আজ পোষ্টাফিস হইতে আনিয়াছে। তাই তাহার ধারণা এতগুলি চিঠি আর একস্থান হইতে আসে নাই, অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আসিয়াছে।

এইরূপ সন্দেহ সংশয়-পূর্ণচিত্তে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া রমেশচন্দ্র চিঠিগুলি হাতে তুলিয়া লইলেন এবং সুনীতির চিঠি

আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, প্রত্যেক খানাই সুনীতির হস্তাক্ষরিত—প্রত্যেকখানির ডাকমোহরেই সুনীতির পিত্রালয়ের গ্রামের নাম অঙ্কিত! রমেশচন্দ্র অবাক হইলেন—ভাবিতে লাগিলেন অর্থ কি? সুনীতি একদিনে এতগুলি পত্র লিখিয়াছে? তিন চারি দিন লিখিতে পারে নাই বলিয়া কি একদিনে সব কয়খানা লিখিয়া বাকী পূর্ণ করিয়াছ? না, কোনও কারণে চিঠি এ কয়দিন পথে কোথাও আটক হইয়া ছিল? দেখি; চিঠির তারিখ গুল।

চিঠির তারিখ পরীক্ষা করিয়া রমেশচন্দ্রের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল।—কিছু সন্দেহও হৃদয়ে প্রবেশ করিল। দেখিলেন—চিঠি কয়খানিতে পর পর তিন চারি দিনের তারখ, আরও দেখিলেন—যেমন পত্র প্রেরণ করিবার প্রথম পোষ্ট আফিসের মোহরে তারিখ পর পর রহিয়াছে, এখানেও পত্র পৌঁছিবার পোষ্ট আফিসের মোহরেও তারিখ তদ্রূপ পর পর রহিয়াছে;—আরও দেখিলেন, কেবল একখানা চিঠি অদ্যদিনের তারিখ সংযুক্ত আর অন্যগুলি তৎপূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে প্রত্যেক দিনের তারিখ সম্বলিত।

রমেশচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন—ব্যাপার কি? মোহর-দৃষ্টে দেখিতেছি—প্রত্যেক দিনই যথানিয়মে চিঠি আসিয়াছে, তবে আমি পাই নাই কেন? তবে সবগুলি একদিনে আসিয়া আমার হাতে পৌঁছিল কেন?

রমেশচন্দ্রের সন্দেহ হইল। সঙ্গে সঙ্গে রামভজনের ভাব পরিবর্ত্তনের কথাও মনে পড়িল। তাহার মনে হইল—বোধ হয় ইহা রামভজনের কীর্ত্তি;—বোধ হয় রামভজনই চিঠি লইয়া

কিছু গোলমাল করিয়াছে। তখন আবার মনে প্রশ্ন উঠিল—সে কেন, কি উদ্দেশ্যে এইরূপ করিবে? আমার চিঠি লুকাইয়া আমাকে চিন্তিত করাইয়া, আমাকে কষ্ট দিয়া তাহার কি স্বার্থ সিদ্ধি হইবে?

মনেই আবার প্রশ্নের উত্তর হইল—যদি সে তাহা না করিয়া থাকিবে, তবে সে এরূপ অনুতপ্ত হইল কেন—ঐ রূপ পাগলের ন্যায় ছুটিয়া ঘরে গেল কেন?—আবার সব চিঠিগুলি পায়ের উপর ফেলিয়া লুটাইয়া পড়িয়া ক্ষমা চাহিল কেন? না, নিশ্চয়ই সে অপরাধী, তাহার যাহাই উদ্দেশ্য হউক না কেন—সে যে চিঠিগুলি গোপন করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হইবে—সে কেন এরূপ করিয়াছিল, তারপর তাহাকে যথোচিত দণ্ড দিতে হইবে।

মনে মনে এইরূপ মীমাংসা করিয়া রমেশচন্দ্র লঘু চিত্তে—কারণ তাহার মনে হইল যে যখন প্রত্যেক দিনই, নিয়মিত রূপে পত্র আসিয়াছে, তখন যে বিপদ আপদের আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহা অমূলক—পত্র গুলি ক্রমে ক্রমে পাঠ করিতে লাগিলেন।

পত্রপাঠ করিতে করিতে রমেশচন্দ্রের দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—এক কি অজানা আনন্দে হৃদয় ভরিয়া গেল।

এই পত্র কয়খানার সর্ব্ব প্রথম পত্রে—লেখা আছে—'প্রিয়তম, আমার শরীর কয়েক দিন যাবৎ অসুস্থ বোধ হইতেছে; আজ দুই মাসের উর্দ্ধকাল পর্য্যন্ত তোমার শ্রীচরণ সেবা করিতে পারিতেছি না, কবে যে পুনঃ শ্রীচরণে স্থান পাইব...ইত্যাদি।”

তাহার পরের পত্রেও ঐরূপ ভনিতা—শরীর অসুখের বিশেষ কিছু উল্লেখ নাই।

তৃতীয় পত্রে একটু অতিরিক্ত আভাস আছে। চতুর্থ পত্রে তাহার পূর্ণ ঝঙ্কার আছে। রমেশ চন্দ্রের শরীর এই দুই পত্র পড়িয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

স্ত্রী স্বামীর নিকট পত্র লিখিয়াছে—কতই প্রাণের কথা লিখিয়াছে; তাহা আমাদের সব জানিবার বা জানাইবার অধিকার নাই। তবে এই টুকু ছিল—জানিয়াছি—...আমার শরীর বড় অসুস্থ, মাথা সর্ব্বদা ঘুরে, কিছু খাইতে পারি না—খাইলেই বমি হয়। তবে, প্রিয়তম, মা এবং অন্যান্য লোক যেরূপ বলিতেছেন—তাহাতে ইহা ব্যারাম নয়, ইহা—কি বলিব, লজ্জা করে—তোমারই দেওয়া দানের, তোমারই প্রসাদের পরিপূর্ণতার প্রথম সুখ অবস্থা—বোধ হয় বুঝিয়াছ—বোধ হয়, আর বুঝাইতে হইবেনা—তবুও আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলি—বোধ হয়, তোমার প্রসাদে, ভগবানের কৃপায়—গোয়ালিনী দিদির আশীর্ব্বাদে আমি মা হইতে যাইতেছি···

বড়ই সুখ-সংবাদ—বিশেষ প্রথম! একটা নূতন অবস্থা, নূতন অনুভূতি! আমার সন্তান হইবে—আমি পিতা হইব—এই যে একটা নূতন অবস্থা, নূতন অনুভূতি বড়ই মধুর, বড়ই আনন্দদায়ক—প্রথম এই সংবাদে হৃদয় স্পন্দিত না হইয়া পারে না, দেহ রোমাঞ্চিত না হইয়া পারে না।

রমেশ চন্দ্র পুলকে পূর্ণ হইয়া শেষোক্ত চিঠি দুইখানা বার বার পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, চক্ষু উজ্জল হইয়া উঠিল—তাহার অধর কোণে হাসি আসিয়া জমিতে লাগিল।

ক্রমে তাহার এত আনন্দ বোধ হইতে লাগিল যে তিনি

আপনা আপনি বলিয়া ফেলিলেন—ঈশ্বর যাহা করেন, ভালর জন্যই করেন। বোধ হয়, দিন দিন এই চিঠি পাইলে, এত আনন্দ অনুভব হইত না—আজ একদিনে, আর বিশেষ কি ভয়ানক চিন্তা ভাবনার মধ্যে এই চিঠিগুলি আর এই সুসংবাদ পাওয়ায়—আমার এই বিপুল আনন্দ বোধ হইতেছে।

এই সময় রামভজন ঘরে প্রবেশ করিয়া রমেশচন্দ্রের পায়ে লুটিয়া পড়িল—"বাবু আমায় ক্ষমা করুন, বাবু ক্ষমা করুন!

রমেশচন্দ্র তাহাকে তুলিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন—'তুমি সত্য কথা বল, কেন চিঠি গোপন করেছিলে, তবে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবো।

রামভজন কম্পিত স্বরে বলিতে লাগিল—বাবু, আমি কর্ত্রীর পরামর্শে ও আদেশে আপনার চিঠি প্রতিদিন পাইয়াও লুকাইয়া রাখিয়াছি—প্রত্যহ ডাক হরকরার হাত হইতে চিঠি লইয়া আমি আমার কাছে রাখিয়াছি। বাবু, কর্ত্রী বলিয়াছিলেন—আরে রামভজন, তোকে ইচ্ছা করিয়াই সব-ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে পাঠাইলাম, তোকে যত বিশ্বাস করি, আর কাহাকেও তত করি না। তুই খুব সতর্ক থাকিয়া দেখিবি—রমেশ বাবু কি রকম লোক, তাহার স্বভাব চরিত্র কিরূপ, তিনি তাঁহার স্ত্রীকে কিরূপ ভালবাসেন। তাঁহার স্ত্রীর চিঠিগুলা লুকাস, তাহা হইলেই দেখিতে পাবি, তাঁহার কিরূপ চিন্তা ব্যকুলতা হয়,—তাহা হইতেই বুঝা যাইবে, তিনি তাহার স্ত্রীর প্রতি কিরূপ অনুরক্ত। বাবু, আমি সেই পরামর্শ অনুসারেই এই মহাপাপ করিয়াছি। বাবু, বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার দাসের দাস হইয়া আজ হইতে আপনার পায়ের তলে পড়িয়া থাকিব।

রমেশচন্দ্র কিছু উত্তর না দিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন—আচ্ছা রামভজন, কর্ত্রীর এইরূপ পরামর্শ দেওয়ার কারণ?

আজ্ঞে তাহা ঠিক জানিনা, বুঝিতে পারি নাই, তবে—থাক, তিনি আমাদের মুনিব—বাবু আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে রক্ষা করিব।

রমেশ চন্দ্রের যুগপৎ ভয় ও চিন্তা হইল। একটু ত্রস্ত স্বরে বলিলেন—'কি বলিলে, রামভজন—আমাকে রক্ষা করিবে—তার অর্থ?

অর্থ?—অর্থ পরে বলিব; বাবু, আমায় ক্ষমা করুন, মহাবীর যেমন রামচন্দ্রের সেবক ছিলেন, আমিও আপনার তদ্রূপ হইব।

রমেশচন্দ্র উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—রামভজন, তোমার যে কিছু দোষ ছিল, ক্ষমা করিলাম। আমার কি বিপদ, বল?

"আর বিপদ নাই, আমি আপনার সহায় থাকিব।"

এই বলিয়া রামভজন রমেশচন্দ্রের পদে প্রণত হইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কবে কি সমস্যা আসি হয় উপস্থিত
মানুষ বুঝিতে তাহা পারে কদাচিত।

রমেশচন্দ্রের মনে একখানা মেঘ ভাসিয়া আছে। রাম-ভজনের সেই কথা শুনা অবধি তিনি সর্ব্বদা ভাবিতেছেন—ঐ কথার অর্থ কি? তবে কি আমি কোন বিপদ-জালে জড়িত হইতে চলেছি? কেন, আমি কি অপরাধ করেছি?

রমেশচন্দ্র অনেক দিন বার বার রামভজনকে তাহার কথার অর্থ ভাঙ্গিয়া বলিতে অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু সে তাহা ভাঙ্গিয়া বলে নাই, তাহার ঐ এক উত্তর—বাবু, আর বিপদ নাই, আমি আপনাকে রক্ষা করিব।"

রামভজনের এই প্রকার উত্তরে রমেশচন্দ্রের প্রাণে অধিকতর ভীতি সঞ্চার হয়—তিনি তখন কম্পিত অন্তরে আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে থাকেন। তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না—তিনি অগ্র পশ্চাত সমস্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করেন—কিন্তু কোথাও তাহার আশু বিপদ ঘটিবার হেতু অনুসন্ধান করিয়া পান না। তাহার মাঝে মাঝে মনে পড়ে—রামভজন বলিয়াছে, সে জমীদারিণীর পরামর্শে তাহার পত্রগুলি লুকাইয়াছিল,—তাহার আরও মনে পড়ে—রামভজন সেই স্বীকার উক্তি করিবার সময় কর্ত্রীকে পিশাচিনী প্রভৃতি আখ্যা দিয়া নিজের অনুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিল—তবে কি কর্ত্রী

আমাকে বিপদাপন্ন করিতে চেষ্টা বা কৌশল করিতেছেন—আমি কি তাঁহার কোন রোষের ভাজন হইয়াছি—কৈ, আমি তো এমন কিছু করি নাই, যাহাতে তিনি আমার উপর রুষ্ট হইতে পারেন।

রমেশচন্দ্র কোন দিকেই কোনও সূত্র পাইলেন না—তিনি রামভজনের বাক্যের রহস্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

রমেশচন্দ্রের মনে একদিকে বিপুল আনন্দ—প্রেমময়ী পত্নীর গর্ভে তাহার পুত্র জন্মিবে—কি আনন্দ, কি সুখ! রমেশচন্দ্র শয্যায় পড়িয়া উন্মুক্ত বাতায়নে নীল গগনে ভাসমান চন্দ্রের প্রতি বদ্ধ দৃষ্টি হইয়া পত্নীর কথা ভাবিতে থাকেন এবং তাহার কোলে ঐ গগনের কোলে চন্দ্রের ন্যায় হাস্যময় সুন্দর শিশুটিকে হাত পা দোলাইয়া ক্রীড়া করিতে কল্পনা বলে মানসনেত্রে দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়েন এবং অননুভূত-পূর্ব্ব আনন্দে মজ্জমান হন। কিন্তু অপর দিকে আবার যখন ভাবেন যে সন্তান প্রসবাদির পর কিছু সুস্থ ও সবলকায় না হওয়া পর্য্যন্ত সুনীতি আসিতে পারিবে না, তখন এ দীর্ঘ বিরহ ও অসাক্ষাৎ জনিত বেদনার ভয়ে তাহার প্রাণটা কাঁপিয়া উঠে—এবং আনন্দোৎ-ফুল্ল হৃদয়ে মেঘের সঞ্চার হয়।

তাই রমেশচন্দ্র এখানে দুই অবস্থার মধ্যে ওলট পালট খাইতেছেন। মানবের জীবনই এই রূপ,—সর্ব্বদাই দুই তরঙ্গে কখনও হর্ষের, কখনও বিষাদের—দুলিতে দুলিতে মানবকে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়।

রমেশচন্দ্রের এই অবস্থা; কিন্তু রামভজনের সেই দিন থেকে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে এখন রমেশচন্দ্রের জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত, রমেশচন্দ্রের সেবায় সে এখন প্রাণপণ করিয়া

খাটিতেছে। রমেশচন্দ্রের আহারে, নিদ্রায়, জীবনের কোন ব্যাপারে যাহাতে কিছু মাত্র অসুবিধা না হয় কিছু মাত্র অসুখের কারণ না থাকে—তাহা সে বদ্ধপরিকর হইয়া দেখিতেছে ও করিতেছে। রমেশচন্দ্রের সুখ সম্পাদন করাই এখন রামভজনের প্রধান উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য। সে প্রত্যহ নিদ্রা হইতে উঠিয়াই পোষ্ট-আফিসে ধাবমান হয় এবং তাহার প্রত্যেকদিনের প্রথম কর্ত্তব্য পোষ্ট-আফিস হইতে রমেশচন্দ্রের পত্নীর হস্তলিপি আনিয়া রমেশচন্দ্রের হস্তে দেওয়া এবং তাঁহার সুখে সুখ অনুভব করা। রাম-ভজন দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে, যে তাহার বাবু প্রতিদিন রীতিমতে পত্নীর পত্র পাইলে নিরতিশয় আনন্দে দিন যাপন করেন—এবং তাঁহার সুব্যবহারে ও (সুআলাপে) সকলে পরম সুখ লাভ করে। তাই—রামভজন এইটিই প্রথম ও প্রধান কার্য্য ধরিয়াছে।

রামভজনের যত্নে ও পরিচর্য্যায় রমেশচন্দ্রের দিন বেশ সুখে ও শান্তিতে কাটিতে লাগিল—কিন্তু মাঝে মাঝে সেই কাল মেঘখানা—যাহা রামভজনের কথায় সঞ্চারিত হইয়াছিল—হৃদয় গগনে ভাসিয়া উঠিয়া কিছু ভয় ও বিষাদ কালিমার সঞ্চার করে। রমেশচন্দ্র ভাবিতে থাকেন—'রামভজন ঐরূপ বলিল কেন? আমার ভয়ের কারণ কোথায়—আমাকে কোন্ বিপদ হইতে রক্ষা করিবে সে?

একদিন নৈশআহারান্তে শয্যায় শুইয়া নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বক্ষণে এইরূপ নানা কথা মনে মনে ভাবিতেছেন ও আলোচনা করিতেছেন—এমন সময় রামভজন আসিয়া সজোরে দরজায় করাঘাত করিল—'বাবু, ঘুমিয়েছেন কি?'

রমেশচন্দ্র বলিয়া উঠিল—'কে—রামভজন? কেন?'

'বাবু, টেলি আসিয়াছে।'

রমেশচন্দ্রের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল—ধরফর করিয়া তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন। ভীতু বাঙালীর প্রাণ চিরদিনই টেলিগ্রামের নামে কম্পিত হয়। তাঁহার আশঙ্কা হইল—বুঝি সুনীতির কোনও অমঙ্গল সংবাদ।

তিনি নিতান্ত ভয় ব্যকুল চিত্তে, দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন এবং কম্পিত হস্তে রসিদ সহি করিয়া টেলিগ্রাম গ্রহণ করিলেন।

রামভজন আলো ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল—রমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে লেপাফা ছিঁড়িয়া—চঞ্চল নয়নে বার্ত্তার উপর চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া, এক স্বস্তির নিশ্বাস নিক্ষেপ করিলেন। তাহার বদনে যে ব্যাকুলতা ভাব ছিল—তাহা অপসারিত হইয়া গেল।'

রামভজন জিজ্ঞাসা করিল—'বাবু,' কে টেলি করিয়াছে, সংবাদ ভাল ত ?''

রমেশচন্দ্র বলিলেন—আমাদের সদরে যেতে হবে। কর্ত্রীর গুরুতর পীড়া—আমাদের সদরে অবিলম্বে যাবার হুকুম হয়েছে।

রামভজন—''কি ব্যারাম, বাবু ? জীবনের ভয় আছে নাকি ?—বাবু, কর্ত্রী আমার একমাত্র আশ্রয়—কর্ত্রী যদি মারা যান্, আমি অকূল পাথারে পড়িব।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—তা কিছু ত' বুঝতে পারছি না—সে বিষয়ে বিশেষ কিছু লিখে নাই। টেলিগ্রাফ পেয়েই রওনা হ'তে লিখেছে—লিখেছে, কঠিন পীড়া। আমাদের কালই প্রাতে রওনা হ'তে হবে—সব বন্দোবস্ত এই রাত্রেই করে ফেল।

রামভজন কর্ত্রীর ব্যারামের সংবাদে নিরতিশয় ব্যকুল হইয়া

পড়িল—কারণ সে তাঁহার অতি পুরাতন ভৃত্য এবং তাহার হৃদয়ও ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার ডোরে কর্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল।

রামভজন অতি ক্ষিপ্র হস্তে সমস্ত বন্দোবস্ত করিতে লাগিল এবং সমস্ত রজনী জাগিয়া ঠিক প্রভাতেই যাহাতে রওনা হওয়া যায়, তাহার আয়োজন সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিল।

অতি প্রত্যূষে রমেশচন্দ্র রামভজনসহ সদরে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

"প্রেম—এমনই জিনিষ!
প্রেমাস্পদ স্পর্শে দূর
সর্ব্ব জ্বালা দাহ বিষ!"

কর্ত্রী ব্রহ্মময়ীর পীড়া—জ্বর। আজ দশদিন যাবৎ জ্বর,—ভয়ানক জ্বর—বিরাম হয় নাই। রেমিট্যাণ্ট জ্বর—সঙ্গে অন্যরূপ গ্লানিও যথেষ্ট আছে। মাথা গরম, চোথ রক্তবর্ণ, ডাক্তারগণ আশঙ্কা করিতেছেন বিকার দেখা দিবে।

কর্ত্রী রোগে ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন আর মধ্যে মধ্যে হৃত চেতন প্রায় পড়িয়া রহিতেছেন। চিকিৎসার ত্রুটি হইতেছে না, দুই তিন জন কৃতবিদ্য ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতেছেন। সেবা শুশ্রূষাও যথাবিধি মতে চলিতেছে।

সাত দিন পর্য্যন্ত জ্বরের প্রকোপ ভয়ঙ্কর ছিল সে কয়দিন তাঁহার জ্ঞান ছিল না বলিলেও হয়, সে কয়দিন জ্বরের উত্তেজনায় কথন কি বলিতেন তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারিত না।

অষ্টম দিন থেকে, অবস্থার একটু উন্নতি, জ্বরের কিছু উপশম দেখা যাইতেছে—একেবারে বিরাম হয় নাই। মাথাও যথেষ্ট গরম আছে। আজ দশম দিনে তাহার জ্ঞান কিছু ফিরিয়াছে; তিনি ক্ষীণস্বরে কথনো কথনো কাহাকে দুই একটি কথা বলিতেছেন।

জ্ঞান সঞ্চারের পর তিনি অনেকক্ষণ নীরব রহিয়া এদিক ওদিক চাহিলেন; কাহাকে যেন পাইলেন না। ধীরে ধীরে

পার্শ্ববর্ত্তিনী দাসীকে বলিলেন—আমাদের সব-ম্যানেজার বাবু কোথায়?

দাসী বলিল—মা, সব ম্যানেজার বাবু ত' আসেন নি; তিনি মফঃস্বলে আছেন।

কর্ত্রী—কেন, আমার ব্যারামের সংবাদ তাঁকে দেওয়া হয় নি?

দাসী—তা ত' জানি না, মা।

কর্ত্রী—ম্যানেজার বাবুকে ডাক্।

এই সময় ম্যানেজার স্বয়ংই তথায় আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন—কর্ত্রী, আজ কেমন আছেন? এখন কেমন বোধ হচ্ছে?

কর্ত্রী—আজ কিছু ভাল বোধ হচ্ছে। ম্যানেজার বাবু, সব ম্যানেজার বাবুকে আমার অসুখের খবর দেন নি?

ম্যানেজার—না, খবর কি পাঠাব?

কর্ত্রী—হাঁ, এখনই টেলিগ্রাফ করে দিন। তাঁকে বড়—(হঠাৎ থামিয়া)—হাঁ, আমার যে রকম পীড়া, কি হয় বলা যায় না, আপনাদের সকলেরই এ সময়ে কাছে থাকা সঙ্গত।

ম্যানেজার সব বুঝিলেন—তাঁহার অধর প্রান্তে একটু হাসির মত আসিয়া মিলাইয়া গেল। কর্ত্রী বোধ হয় তাহা লক্ষ্য করিলেন—তাহার পাংশু বদন কিছু লাল হইয়া উঠিল।

ম্যানেজার বলিলেন—এখনই টেলিগ্রাফ করে দিচ্ছি। কা'ল রওনা হ'লেই পরশু এসে পৌঁছিতে পারবেন।

ম্যানেজার চলিয়া গেলেন।

তারপর দুই দিন গিয়াছে। আজ কর্ত্রীর পীড়ার দ্বাদশ দিন—আজ প্রাতে রমেশচন্দ্র আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াই অতি

ব্যস্তভাবে কর্ত্রীকে দেখিতে আসিলেন। কর্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন।

বলিলেন—এসেছেন? বসুন।

রমেশচন্দ্র সম্মান ও ভক্তি মিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন আছেন, আজও কি জ্বর আছে?

কর্ত্রী—আজ দু'দিন থেকে কিছু ভাল—তবে জ্বর বোধ হয় এখনও একটু আছে। ডাক্তার এলেই বুঝা যাবে। আপনি কি হাত দেখতে জানেন—দেখুন না, জ্বর আছে কি না?

রমেশচন্দ্র—না আমি ভাল হাত দেখতে জানি নে। আপনার এরূপ পীড়া অথচ আমরা কিছু জানতাম না। জানলে পূর্ব্বেই আসতাম।

এই কথায় কর্ত্রীর বড় সুখ বোধ হইল। কি এক আশার মন্ত্রে হৃদয় তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তাঁহার চোখ মুখ দিয়া আনন্দ জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি নিজেকে একটু সংযত করিয়া বলিলেন—'আমার গা টা বড় জ্বলে যাচ্ছে—মাথা যেন ফেটে যেতে চায়—দেখুন ত কপালে হাত দিয়ে শরীরটা খুব গরম নাকি?

রমেশচন্দ্রের মনে কিছু নাই—তিনি সরলভাবে কর্ত্রীর আহ্বানে তাঁহার কপালে হাত স্থাপন করিলেন। কর্ত্রীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল—তাঁহার সর্ব্বদেহে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল। তিনি স্বর্গ-সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্রের করস্পর্শে যেন গায়ের জ্বালা, মাথার যন্ত্রণা অর্দ্ধেক কমিয়া গেল।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—হাঁ, কপালটা বড় গরম, শরীরে খুব উত্তাপ আছে—এখনও কিছু জ্বর আছে।

রমেশচন্দ্র হাত তুলিয়া আনিলেন।

কর্ত্রী বড় সুখে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল —আহা রমেশচন্দ্র যদি এইরূপ সর্ব্বদা তাহার কপালে হাত বাখিয়া পার্শ্বে বসিয়া থাকেন, তবে বুঝি শবীরে কিঞ্চিৎ জ্বালা থাকে না। মাথা ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল—রমেশ-চন্দ্র তাঁহার ধারে বসিয়া তাঁহার কপালটায় হাত বুলান।

কিন্তু ইহা কি মুখ ফুটাইয়া বলা যায়? জিহ্বা কি এতই প্রগল্‌ভা যে এই কথা বলিয়া ফেলিবে? মনের মধ্যে নানা সাধই জাগিতে পারে,—মন কোথায় কোন গভীরতম দেশে বসিয়া যা তা ইচ্ছা কবিতে পারে—তাহা বাহিরের কেহ জানিতে পাবে না, বুঝিতে পারে না—তাই বলিয়া কি জিহ্বা লজ্জা সরমের জলাঞ্জলি দিয়া, মনের দাসী হইয়া উচিত অনুচিত বিবেচনা না করিয়া মনেব বাসনা প্রকাশ করিবে? না, জিহ্বা মনের মত স্বাধীন, নির্ম্মুক্ত নয়, সে অনেক সংযত ও লজ্জা সবমেব অধীন।

কর্ত্রীর প্রাণে প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও, মুখ খুলিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না—কেবল ধীব কণ্ঠে—এঁ্যা, এখনও খুব জ্বর আছে? তবে বুঝি এবার আর বাঁচবো না।

রমেশচন্দ্র বলিলেন না না, এত ভাবিবেন না। ভগবানের কৃপায় শীঘ্রই সেরে উঠবেন। জ্বর দিন দিন কমে যাচ্ছে, ক্রমে বিরাম লাভ করবে। কোন ভয়ের কারণ নাই।

কর্ত্রী নির্ব্বাক হইয়া রমেশচন্দ্রের প্রতি কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার বোধ হইল—রমেশচন্দ্র যেন পূর্ব্বের চেয়ে কিছু স্থূল হইয়াছেন, আরও সুশ্রী হইয়াছেন।

রমেশচন্দ্র কর্ত্রীর স্থির দৃষ্টিতে কিছু সঙ্কুচিত হইয়া নম্রস্বরে

বলিলেন—আমি এখন বিদায় নিতে ইচ্ছা করি। গরুর গাড়িতে কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই, আমার শরীরটা বড় ঝিম ঝিম করছে—কাল ভাল খাওয়াও হয় নাই, স্নান করে কিছু আহার করলে শরীরটা অনেক সুস্থ হবে। তাই যাবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

কর্ত্রী তাঁহার দিকে আবেগ ভরে চাহিয়া বলিলেন—আচ্ছা, তবে এখন যান, আহারের পর কিছু বিশ্রাম ক'রে আবার আসবেন। আপনি কাছে থাকলে, আমার বড় ভাল লাগে—আপনি এতক্ষণ ছিলেন, বড় সুখে ছিলাম।

রমেশচন্দ্র উঠিলেন। তিনি দেখিলেন—কর্ত্রী কি রকম এক অতৃপ্ত দৃষ্টিতে তাঁহার প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন। তাঁহার বড় লজ্জা হইল—তাঁহার কাছে এই দৃষ্টির ভাব বড় ভাল লাগিল না।

তিনি কর্ত্রীকে তাড়াতাড়ি অভিবাদন করিয়া দ্রুত গতিতে চলিয়া আসিলেন।

প্রকৃতই এতক্ষণ কর্ত্রী বেশ শান্তিতে ছিলেন;—যেমন রমেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন, অমনি তাঁহার যেন গাত্র জ্বালা বাড়িল, মাথা ফাটিয়া যাইতে লাগিল—তিনি শয্যায় পড়িয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ।

কামার্ত্তা রমণী যেন কাল ভুজঙ্গিণী।
অথবা প্রমত্তা মত্তা ভীম তরঙ্গিণী॥

প্রায় সন্ধ্যা ; দিনদেব বিদায় লইয়া বিশ্রাম মন্দিরে যাইতেছেন —চতুর্দ্দিক ক্রমে ক্রমে তমিস্রা দেবীর ক্রোড়স্থ হইতেছে। বেশ একটু হাওয়া বহিতেছে—মৃদুমধুর সুখস্পর্শ বাতাসে তপ্ত শরীর শীতল হইতেছে। আকাশের এক কোণে খণ্ড চন্দ্র উঠিয়া আসন্ন সন্ধ্যার ছায়াকে একটু স্নিগ্ধ আলোকোজ্জ্বল করিয়াছে। পাখীরা গাছে গাছে নানা সুরে গান ধরিয়াছে। বিশ্বময় বেশ একটু শান্তির আনন্দের আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে!

কর্ত্রী ব্রহ্মময়ী আজ অনেকটা ভাল, জ্বর বিরাম লাভ করিয়াছে, মাথার যন্ত্রণা কমিয়াছে। দীর্ঘকাল রোগ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করার পর শরীরটা আজ যেন একটু ভারমুক্ত, বেশ যেন একটু আলগা আলগা, পাতলা পাতলা বোধ হইতেছে। তিনি তাঁহার কক্ষে পালঙ্ক উপরে উপাধানের উপর ভর করিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন এবং উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া আকাশের পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছেন—তাঁহার মনে হইতে লাগিল—আহা, এ সময় পার্শ্বে যদি একজন আনন্দদায়ক সঙ্গী থাকিত—আহা, এই সময় যদি রমেশচন্দ্র আসিয়া কাছে বসিত--তবে কিই যে..

এমন সময় বারান্দায় কাহার পদ শব্দ শুনা গেল। রমেশচন্দ্র ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিয়া কর্ত্রীকে সসম্মান অভিবাদন করিয়া

বলিলেন—"আজ, বোধ হয় অনেকটা ভাল, জ্বর যখন হয় নাই, তখন বোধ হয় শরীরের অন্য গ্লানিও কম?

এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি কিছু দূরে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কর্ত্রী কিছু উত্তর না দিয়া তাহার প্রতি মন্ত্রমুগ্ধ ভাবে চাহিয়া রহিলেন—তাঁহার দেহ পুলকে ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন—যাহাকে চাহিতেছিলেন—তিনিই ত কাছে।

পরে চোখ নত করিয়া বলিলেন—হাঁ, আজ অনেকটা ভাল বোধ হচ্চে। আপনি আজ প্রাতে আসেন নি কেন?

রমেশচন্দ্র বলিলেন—তজ্জন্য আমি দুঃখিত, ক্ষমা প্রার্থনা করি, কর্ত্তব্যের ত্রুটি হয়েছে। এতদিন মফঃস্বলে কি কি কাজ করেছি, এবং প্রজাদের কিরূপ অবস্থা দেখলাম, ও মহালে খাজানা আদায় প্রভৃতি কিরূপ হ'তেছে, সেই সব সম্বন্ধে ম্যানেজার বাবুর সহিত নানা কথাবার্ত্তা করতে ও কাগজপত্র ঠিক করতে অনেকটা বেলা হ'য়ে গিয়েছিল—বেলা প্রায় এগারটা বেজে উঠেছিল। তবুও একবার শ্রীচরণ দর্শন করবো ভেবেছিলাম, তবে যখন ডাক্তারের মুখে শুনলাম যে আর জ্বর নাই, আপনি বেশ ভাল আছেন, তখন মনে করলাম—তা'হলে এখন এই অসময় আর বিরক্ত করা উচিত নয়, একবারে সন্ধ্যার সময় এসে দেখা ক'রে সংবাদ নেব। তাই এখন এসেছি।

"বুঝলাম—বেশ, আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, এখানে বসুন।

"না না, আমি বেশ আছি, আপনার দয়া ও সৌজন্য অচিন্ত-নীয়। আপনি ভাল আছেন দেখেই আমি নিতান্ত তুষ্ট।"

"না, না, আপনি দাঁড়িয়ে রইলে আমার কষ্ট অনুভব হয়। আসুন, আসুন, এখানে বসুন।"

এই বলিয়া কর্ত্রী পালঙ্কের একপার্শ্বে হস্ত স্থাপন করিলেন।

রমেশচন্দ্র—'আচ্ছা, আমি এইখানেই বসছি। এই বলিয়া পালঙ্কের অদূরস্থ একখানা চেয়ারের এক কোণে অতি সসম্ভ্রমে বসিলেন।

কর্ত্রীর তাহা ভাল লাগিল না। তিনি রমেশচন্দ্রকে আজ নিকটে বসাইতে চান,—বড় সুযোগ—নির্জ্জন কক্ষ—দাসদাসীরা কেহ শীঘ্র এদিকে আসিবে না—একটু সাহসের অভাবে কেবল মনের বাঞ্ছা অপূর্ণ থাকিয়া যায়। কর্ত্রী এ সুযোগ ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না—এতদিন যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে—তাহার কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিতে তিনি আজ কোমর বাঁধিলেন।

সজোরে সাহসের সহিত বলিয়া ফেলিলেন।

"রমেশবাবু, আমার কাছে আসুন, এই পালঙ্কে আমার পার্শ্বে বসুন—আপনি কাছে বসলে যে আমার শরীরের সব জ্বালা দূর হয়ে যায়।"

রমেশচন্দ্র যেন শরাহত হইলেন। তিনি একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ স্থির হইয়া রহিলেন।

কর্ত্রী তাহার ভাব ভুল বুঝিলেন। তিনি মনে করিলেন—রমেশচন্দ্র বুঝি লজ্জায় অথবা ভয়ে অগ্রসর হইতে সঙ্কুচিত হইতেছেন। তিনি নিজের শরীর উত্তোলন করিয়া, হস্ত প্রসারণ-

পূর্ব্বক রমেশচন্দ্রের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া আবেগভরে বলিলেন—"এস, রমেশচন্দ্র, এস,—তোমার ভয় কি, তোমার লজ্জা কি—এস, আমার কাছে—আমি তোমায় বুকে ক'রে রাখবো।" রমেশচন্দ্রের এবার জ্ঞান ফিরিল—তিনি সব বুঝিলেন। তাহার মুখে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল, তিনি সজোরে হাত টানিয়া লইয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—

"মা, মা, মা—আপনার একি কথা—একি আচরণ। আপনি আমার মনিব, কর্ত্রী, মাতৃস্থানীয়া—আপনার সন্তান তুল্য সেবকাধমের প্রতি, অধীনস্থ কর্ম্মচারীর প্রতি একি অকৃপা ব্যবহার, নিষ্ঠুর আচরণ, অসঙ্গত ভাব।"

কর্ত্রীর শরীর তখন আবেগে কাঁপিতেছে—তিনি স্ত্রীজন সুলভ সমস্ত লাজ সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া প্রাণের কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন—তিনি আর বাঁধ মানিতে চাহিলেন না—আবেগভরে মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন—

"রমেশ, রমেশ, না, না, ওসব সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে আমার নেই—তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব, তুমি আমার প্রাণের নিধি, যেদিন তোমায় আমি প্রথম দেখেছি—সেই দিনই আমি তোমায়-সব দিয়েছি। দেখ রমেশ, আমি ঐশ্বর্য্যশালিনী বালবিধবা—আমার অতৃপ্ত যৌবনের আকাঙ্খায় আমি হাবুডুবু খাচ্ছি—আমার জীবন দুর্ব্বহ হয়েছে—আমি আর সহ্য করতে পারছি না—এস, আমার সাধ পূর্ণকর, এস, বুকের আগুণ নিবাও; আমার কোনও অভাব নাই—তোমারও কোন অভাব থাকবে না; তোমাকে ম্যানেজার করবো—তুমি আমার সম্পত্তির মালীক হবে—আমরা দু'জনে পরম সুখে থাকবো—এস, প্রাণের রমেশ এস, আমার বুকে এস—

এই বলিয়া তিনি উন্মত্তার ন্যায় উঠিয়া রমেশচন্দ্রকে পুনরায় ধরিতে অগ্রসর হইলেন।

রমেশচন্দ্র কালভুজঙ্গিনী দেখিয়া লোক যেমন পশ্চাৎদিকে লম্ফ প্রদান করে, তদ্রূপ পশ্চাতে সরিয়া—

"মা, মা, কর্ত্রী, আপনি এত দুশ্চারিণী, পাতকিনী, তাতো জানতাম না—আমায় আপনার কার্য্য হ'তে বিদায় দিন"—বলিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া গেলেন।

হতভাগিনী রমণী ভগ্নাশ হইয়া শরবিদ্ধা হরিণীর ন্যায় শয্যায় লুটিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কাম হয় প্রতিহিংসা—যদি প্রত্যাখ্যান।
প্রেম শুদ্ধ দেহে প্রাণে পড়ে বলিদান॥

পরদিন প্রাতে কর্ত্রী ব্রহ্মময়ী নিরতিশয় বিষন্ন মনে পালঙ্কের উপর বসিয়া কি চিন্তা করিতেছেন—চোখে মুখে একটা ভ্রুকুটি পূর্ণ ভীতিজনক ছায়ার আবরণ পড়িয়াছে,—দেখিলেই হৃদয়ঙ্গম হয়, যেন মানস সাগরে প্রবল ঝটিকা বহিয়া যাইতেছে, তাহার বেগে উত্তাল তরঙ্গ যেন বেলা ভূমি অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছে।—এমন সময় বড় ম্যানেজার বাবু একখানা দরখাস্ত অনুরূপ কাগজ হস্তে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বড় ম্যানেজারের মুখে ঈষৎ হাসি সুনিবিড় গোঁফ গুচ্ছের অন্তরালে খেলিতেছিল। কর্ত্রী কুঞ্চিত নয়নে, তাহার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওখানা কি?"

বড় ম্যানেজার কিছু গম্ভীর হইয়া উত্তর করিলেন—আমাদের ছোট ম্যানেজার চাকরী ত্যাগ করতে চান—এখানা তাহার পদত্যাগ পত্র।

শুনিয়া কর্ত্রীর মুখ আরও কালো হইয়া গেল—তাঁহার চোখের কাছে যেন একটা জমাট অন্ধকার আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া রহিলেন—কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত কি বলিবেন, ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না।

সুচতুর ম্যানেজারের নয়নে এই ভাব বৈলক্ষণ্য অপরিলক্ষিত রহিল না। তিনি কর্ত্রীর মুখের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন; তাঁহার নয়নের কোণে একটু প্রতিহিংসা কুটিল বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছিল— তিনি তাহা চাপিয়া ফেলিলেন।

কর্ত্রীর চোখ জলে ভরিয়া আসিতেছিল, তিনি প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। রমেশচন্দ্র চলিয়া গেলে যে তিনি নিতান্তই বেদনা অনুভব করিবেন—তাহার হৃদয় আকুল রোদনে কাঁদিতে থাকিবে। তিনি প্রকৃতই তাহাকে একটু ভাল বাসিয়াছিলেন; তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সে ভালবাসার মধ্যে বোধ হয় সম্পূর্ণ কেবল কামনা লালসাই ছিল না। ভালবাসা অর্থাৎ প্রেমানুরাগে আপনাকে পুরুষের নিকট বিকাইয়া দেওয়া বোধ হয় রমণীস্বভাবের স্বতঃসিদ্ধ প্রবৃত্তি। প্রত্যেক রমণীর সেই আকাঙ্খার সামগ্রী—বিশ্বসংসারে একজন। সেই প্রবৃত্তি বাধা-প্রাপ্ত হইয়া নানা মুখী হইয়া ভিন্নরূপ ধারণ করিতে পারে, কিন্তু অন্তঃসলিলা প্রবাহিনী মরিয়া যায় না। জীবনের যে কোন বয়সে যৌবনেই হউক, প্রৌঢ়াবস্থায়ই হউক অথবা বার্দ্ধক্যেই হউক, বিশ্বসংসার মাঝে সেই একটি লোক নয়নগোচর হইলেই সেই শুষ্কপ্রায়া অন্তঃবাহিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে এবং সেই আপনার জনকে আপন করিয়া লইতে বেলা-কূল ভাঙ্গিয়া প্রবাহিত হয়। তবে যে ক্ষেত্রে বেলাকূল অভ্যাস ও শিক্ষার গুণে প্রস্তরময় হইয়া গিয়াছে, তরঙ্গ আঘাতে দৃঢ় অটল থাকিবার শক্তি লাভ করিয়াছে, সেই স্থলে তরঙ্গ ফিরিয়া আসিয়া আবার পূর্ব্ব খাদেই পড়ে। কিন্তু যে স্থলে বেলাভূমি এখনও বালুময় আছে, এখনও জলের

বেগে ভাঙিয়া ধ্বসিয়া পড়িতে পারে, সেখানে আর তরঙ্গ কোন বাঁধ মানে না; সমস্ত কূলবেলা ভাঙিয়া চুরিয়া স্বাধীন পথে ধাবিত হয়।

যাহাই হউক, কর্ত্রীর প্রাণে আঘাত লাগিল। তিনি ঐ সংবাদে নিতান্তই ব্যথিত হইলেন—তিনি ভাবিতে লাগিলেন—কেন তাহাকে কা'ল প্রাণের কথা বলিয়া ফেলিলাম, ক্রমে ক্রমে তাহাকে বুঝিয়া, ক্রমে ক্রমে তাহাকে আমার অনুগত করিয়া, মনোভাব প্রকাশ করিলেই বোধ হয় ভাল হইত।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার নারী মর্য্যাদা জাগিয়া উঠিল—তাহার সজল নয়ন শুষ্কতা প্রাপ্ত হইল—যেখানে সলিল আসিয়া উচ্ছ্বসিত হইতে চাহিতেছিল, সেখানে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উদ্গত হইবার উপক্রম করিল—তিনি ভাবিতে লাগিলেন কী! কোথাকার একটা গরীব লোক আমার চরণের দাস তুল্য একটা সামান্য লোক আমাকে অপমান করিয়া চলিয়া যাইবে! আমার অনুগ্রহ পাইলে ও মানুষ হইত, ওর ভাগ্য ফিরিয়া যাইত! ওকিনা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া, অবহেলা করিয়া, আমার কর্ম্মত্যাগ করিয়া যাইতে চায়! এত বড় স্পর্দ্ধা—এত বড় অহঙ্কার!! আচ্ছা, দেখি কি করিয়া যায়!

ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় মাথা বাঁকা করিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—

কেন কর্ম্ম-ত্যাগ করবে সে?

বড় ম্যানেজার তাহার রোষ দীপ্ত বদন দেখিয়া একটু ভীত হইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন—'তাতো বিশেষ কিছু জানি না, তবে যতদূর এই দরখাস্তে লিখেছেন, তাতে দেখছি, তাহার

এখানে নানারূপ অসুবিধা হচ্ছে, তাহার ইচ্ছা, তিনি আর চাকরি করবেন না, আবার ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করবেন।"

কর্ত্রী একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিলেন—'বটে! ওকালতীতে কি মধু, তাতো একবার বুঝে এসেছেন। আচ্ছা, যেতে হয় যান, কিন্তু এগ্রিমেণ্টের কথা কি তাঁর মনে আছে? ২০০০৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে যেন তিনি এ বাড়ী হ'তে নামেন!

এই বলিয়া, বলিলেন—"দেখি দরখাস্তখানা।"

ম্যানেজার বাবু দরখাস্তখানা তাঁহার হাতে দিলেন। তিনি দরখাস্তখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন, পরে তাহার শিরোদেশে, এইরূপ আদেশ লিপি করিলেন—

"আপনি যাইতে পারেন, অন্ন থাকিলে অনেক কুকুর দুয়ারে আসিবে। তবে এগ্রিমেণ্ট অনুসারে যে সর্ত্ত আছে তাহা লঙ্ঘন করিলে মহা বিপদে পড়িবেন। দুই হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিবার পূর্ব্বে এই পদত্যাগ স্বীকার করিতে পারি না।"

এই আদেশ লিখিয়া তন্নিম্নে নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দরখাস্ত খানা প্রত্যার্পণ করিলেন। বড় ম্যানেজার তাহা লইয়া চক্ষু ফিরাইয়া আদেশের মর্ম্ম বুঝিলেন। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তাহার পঞ্জর কাঁপাইয়া উঠিয়া নাসিকা পথে বহির্গত হইল। রমেশচন্দ্রের জন্য তাঁহার প্রাণ একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিহরিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল—এই রমনীর তো অসাধ্য কিছুই নাই, এ না জানি কি করিতে কি করিয়া বসিবে। ভয়ানক মেয়ে মানুষ—শিকার ছুটিলে শার্দ্দূলী যেরূপ ক্ষিপ্তা হয়, এ প্রায় সেরূপ হইয়াছে।

বড় ম্যানেজার এইরূপ ভাবিয়া বিদায় লইতে যেমন উদ্যত হইলেন—কর্ত্রী তর্জ্জনী তুলিয়া বলিলেন—'যান, এই আদেশ

তাকে দিন নিয়ে। বলিবেন, যেন অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে কার্য্য করে।"

ম্যানেজার বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অভিবাদন করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। কর্ত্রী উত্তেজনায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন—তাঁহার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিতেছিল—তিনি শয্যায় অবসন্ন প্রায় পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া রহিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাপিনীর সহবাস সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ—
পলাইব আমি।
ভিখারী হইয়া যদি পথে ঘুরি নিরবধি
তাও শুভগণি॥

রমেশচন্দ্র চলিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, জিনিষপত্র গুছাইতেছেন—বাঁধিতেছেন—আর মনে মনে এক একবার ব্রহ্মময়ীর প্রবৃত্তির কথা ও তাহার গর্হিত প্রস্তাব স্মরণ করিয়া ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আপন মনে কি বলিতেছেন।

রমেশচন্দ্র আর কিছুতেই এখানে থাকিবেন না—কিছুতেই আর এই মায়াবিনীর অধীনে কার্য্য করিবেন না। তাঁহার সঙ্কল্প স্থির ও অটল।

সেদিন কর্ত্রী ঐরূপ ঘৃণিত ও লজ্জাকর ভাব প্রকাশ ও উক্তি করার পর রমেশচন্দ্র ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া আসিয়া আপনার শয্যায় মুখ গুজিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন তাঁহার মনের অবস্থা অকথ্য ঘৃণা ও ধিক্কারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিনি যেন একেবারে লজ্জায় মরিয়া যাইতেছিলেন। তিনি পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন—ছিঃ ছিঃ কি ঘৃণা, কি লজ্জা—বর্ষিয়সী রমণী—আমার মায়ের তুল্য, আমি মা বলিতাম, মায়ের অধিক ভক্তি ও সম্মান করিতাম—ছিঃ তার এই প্রবৃত্তি—এই হীনতা—রমণী কি এত হীন হয়—এত প্রবৃত্তির দাসী হয়! আবার কি সাহস, কি নির্ভীকতা—যেন লজ্জা মান ভয় কিছু

মাত্র নাই। যেন লোকনিন্দার প্রতি ভ্রুক্ষেপ নাই। কি আস্পর্দ্ধা! অর্থের প্রলোভনে চাকুরীর প্রলোভনে যেন সকলই মুগ্ধ হয়—যেন সমুদয় লোকই আপন ধর্ম্ম আপন কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া পাপলালসার কবলে পতিত হয়! উঃ কি ভয়ঙ্কর স্থান!—না, এস্থানে আর এক দণ্ডও থাকা নয়। না, এখানে থাকিয়া এই পাপিনীর কুহকজালে আবদ্ধ হইতে পারিব না, প্রাণের সুনীতির নিকট বিশ্বাস-ঘাতক হইতে পারিব না, ধর্ম্মলঙ্ঘন করিয়া কখনই মহাপাতকী হইয়া জীবন ধ্বংস করিতে পারিব না, আত্মার শান্তি বিনষ্ট করিতে পারিব না। না, তা কিছুতেই পারিব না, আমি আমার সুনীতিকে লইয়া বরং ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও অর্থের লোভে নিজেকে পতিত করিয়া অন্যরমণীর দাস হইব না।

এইরূপ চিন্তা করিয়া রমেশচন্দ্র লাফ দিয়া উঠিয়া বসিলেন! তখনই দুইখানি পত্র লিখিতে লাগিলেন। প্রথম পত্র সুনীতির নিকট। তাহাতে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া জানাইলেন—যে তিনি এই কর্ম্মত্যাগ করিয়া অচিরেই সুনীতিকে দেখিতে শ্বশুরালয়ে যাইবেন।

দ্বিতীয় পত্র—কর্ম্ম ত্যাগের পত্র। উহাতে প্রকৃত কথা না লিখিয়া, তিনি আর চাকুরী করিবেন না, আবার ওকালতী আরম্ভ করিবেন এবং সেই জন্যই কর্ম্মত্যাগ প্রয়োজন, এইরূপ প্রকাশ করিয়া কর্ম্ম ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি চাহিলেন।

ঐ দুই পত্র লিখিয়া তাঁহার মনে অনেকটা ভার লাঘব হইল ও শান্তি উপস্থিত হইল—তবুও সমস্ত রাত্রি তাহার ভাল নিদ্রা হইল না; এই স্থান ত্যাগ করিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ শান্তি পাইবেন না এইরূপ তাঁহার মনে হইতে লাগিল।

পরদিন যথা সময়ে যথাস্থানে পত্র দুইখানা পাঠাইয়া দিলেন।

কর্ম্মত্যাগ করিয়া যাওয়া সম্বন্ধে যে কোন বাধা বিঘ্ন হইবে, তাহা রমেশচন্দ্রের ধারণাতেই ছিল না। তিনি ভাবিতেছিলেন—আমি কর্ম্ম করিব না, ত্যাগ পত্র দিয়াছি, ইহাতে আর আপত্তি কি হইবে? আমি আজই সন্ধ্যাতক্ এই স্থান ত্যাগ করিতে পারিব। বোধ হয় এগ্রিমেণ্টের কথা তখন তাঁহার মনে ছিল না।

রমেশচন্দ্র জিনিষপত্র গুছাইতেছেন—এমন সময় রামভজন তথায় উপস্থিত হইল। "বাবু কি আজ মফঃস্বল যাইবেন? এইতো সে দিন কত স্থানে ঘুরিয়া আইলেন। মফঃস্বলের জল-বাতাস ভাল নয়, কয়েক দিন বিশ্রাম করিয়া যাওয়া ভাল আছে।"

রামভজন এইরূপ বলিলে, রমেশচন্দ্র কতক্ষণ পর্য্যন্ত রাম-ভজনের মুখের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন না। তাঁহার যেন কি রকম সঙ্কোচ ও লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। রামভজন যখন আপনা হইতে অত কথা বলিয়া কোনও উত্তর পাইল না তখন সে মনে করিল—"বোধ হয় বাবু কোন কারণে রাগ করিয়াছেন"—তাই একটু ভীত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল—

"তবে, বাবু, আমাকে এবার সঙ্গে লইবেন না? না, না,—তা হইবে না, আমি আপনার দাস, আমি সঙ্গে যাইবই, যাই, আমিও কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লই গিয়া।"

এই বলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রমেশচন্দ্র আর নির্ব্বাক্ থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন—'না না, রামভজন, তোমার কিছু উদ্যোগ করতে হবে না আমি যাচ্ছি বটে, তবে মফঃস্বলে নয়, আমি বাড়ী যাব, কাজ ছেড়ে দিয়েছি।'

রামভজনের সম্মুখে যেন বজ্রপাত হইল। সে যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল—আকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—কি, বাবু কি! আপনি কাজ ছাড়িয়া যাইছেন? এঁ্যা এঁ্যা সত্য?

"হাঁ, রামভজন, আমি আর তোমাদের কর্ত্রীর অধীন কাজ করবো না। আমি চাকরী ছাড়বার পত্র দিয়েছি—আমি আজই এস্থান হ'তে বিদায় নেব। তুমি আমার জন্য অনেক করেছ—তোমার কথা আমার চিরদিন মনে থাকবে।"

তা বুঝিয়াছি বাবু,—আপনার মত দেবতা যে এ সংসারে কাজ করিতে পারিবে না, তা আমি অনেক আগেই বুঝিয়াছি। বাবু, এই ঘরে বহু পাপ, বহু পাপ আছে!—এই পাপের পুরীতে কি আপনি থাকিতে পারেন? যে দিন কর্ত্তাঠাকুরাণী আমায় গোপনে ডাকিয়া নিয়া আপনার চিঠি লুকাইয়া আপনার ভাব লক্ষ্য করিতে বলিয়াছিলেন—সেই দিনই বুঝিয়াছিলাম, আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। তা বাবু, আপনি এ সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, সে ভালই। তবে আমার উপায় কি হইবে? আমি কি করিয়া ও চরণ সেবা না করিয়া থাকিব? বাবু, আমিও এ পুরী ত্যাগ করিব, আমিও আপনার সঙ্গে যাইব—"

কথাটা শেষ হইতে না হইতে বড় ম্যানেজার বাবু রমেশচন্দ্রের দরখাস্তখানা লইয়া তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইলেন।

রমেশচন্দ্র আসিয়া সসম্মানে তাঁহাকে এগিয়ে লইলেন এবং রামভজনকে একখানা কেদারা টানিয়া দিতে বলিলেন।

বড় ম্যানেজারবাবু, "থাক্! থাক্ আমার বসার জন্য অত ব্যস্ত হবার দরকার নাই। এই আমি এখানে বসছি"—বলিয়া—রমেশ চন্দ্রের শয্যার এক পার্শ্বে বসিলেন।

রমেশচন্দ্র বুঝিলেন—তাঁহার কি বক্তব্য আছে—তাই বড় ম্যানেজার বাবুর সমীপস্থ হইয়া উৎসুক ভাবে দাঁড়াইলেন। বড় ম্যানেজার বাবু কিছু বাক্যস্ফুট না করিয়া দরখাস্তখানা রমেশচন্দ্রের হাতে দিলেন। রমেশচন্দ্র তাহা পাঠ করিয়া মাথায় হাত দিয়া চৌকির উপর বসিয়া পড়িলেন।

ঊণবিংশ পরিচ্ছেদ।

তুমি যদি খাঁটি রও কে পারে পর্শিতে ;
পড়ে কি কালির রেখা অমল্ল আর্শিতে ॥

বড় ম্যানেজার বাবুর কিছু দয়ার উদ্রেক হইল। সৎলোকের প্রতি লোকের বিদ্বেষভাব স্থায়ী হইতে পারে না। প্রথম প্রথম রমেশচন্দ্রের প্রতি বড় বাবুর একটা হিংসার মত ভাব হইয়াছিল ; কিন্তু ক্রমে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে রমেশচন্দ্র অতি সৎ চরিত্রবান্ লোক, তখন তাঁহার হিংসা ভাব সরিয়া গেল, বরং তিনি তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার পক্ষপাতী হইলেন—তাহাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। তারপর যখন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে নিরপরাধা বেচারী কুটিল-চরিত্রা প্রতিহিংসা-পরায়ণা শক্তিশালিনী রমণী জমিদারিণীর করাল আক্রোশে পতিত হইয়াছে, তখন তাঁহার স্বতঃই রমেশচন্দ্রকে বাঁচাইবার, রক্ষা করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল এবং যাহাতে এই সাধু প্রকৃতি যুবকটি একটি দুষ্টা রমণীর কুচক্রে ধ্বংসমুখে পতিত না হয়, তাহা করিতে মনে মনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাই তিনি নিজেই দরখাস্তখানা লইয়া আসিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, বড় ম্যানেজার বাবু কিছুক্ষণ করুণাপ্লুত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন—তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—

"রমেশবাবু, এখন বুঝলেন ত—এগ্রিম্যান্ট আপনার থেকে

কেন নেওয়া হয়েছিল ;—আপনি সরল ও সৎ, এই সংসারের কুটিলতা ও জটিলতা সম্বন্ধে আপনার জ্ঞান অল্প, কিন্তু আমি তখনই সব বুঝতে পেরেছিলাম, তাই আপনাকে সাবধানও করেছিলাম।”

রমেশচন্দ্র মাথা তুলিয়া সজল নয়নে কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

“হাঁ বড় বাবু তা বুঝেছি! আমি যে এগ্রিমেণ্ট দিয়ে কি ভুল করেছি তা এখন বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এখন উপায়? বড় বাবু, বড় বাবু, আপনি আমার অগ্রজ তুল্য, আপনি আমার একমাত্র বান্ধব ও সহায়—বলুন, বলুন, আমি এই দায়ে কি করে উদ্ধার পাই—হায়, হায়, কেন আমি এই দাসখত দিতে গিয়েছিলাম।”

বড় ম্যানেজার বাবু কিছুক্ষণ গম্ভীর ভাবে ভাবিয়া বলিলেন—“আর উপায় কি রমেশ বাবু?—আমার মতে আপনার এই ষ্টেটে থাকা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। আপনার আর্থিক অবস্থা আমার জানতে বাকী নেই। আপনি দুই হাজার টাকা দিয়ে কর্ম্ম ছেড়ে যেতে পারবেন না—তাহা আপনার পক্ষে অসম্ভব—তদ্রূপ করতে গেলে আপনি সর্ব্বস্বান্ত হবেন। তাহা কোন মতেই যুক্তি সঙ্গত মনে করি না। ভগবানের নাম ক’রে এ স্থানেই থাকুন—কর্ম্ম ত্যাগ করার বুদ্ধি ছাড়ুন।”

রমেশচন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় উঠিয়া বড় ম্যানেজারের হাত জড়াইয়া ধরিলেন—বলিলেন—“বড় বাবু, বড় বাবু, না, না, আমি এখানে কিছুতেই থাকতে পারবো না। আমি ভিক্ষা করে খাই, তবুও আমি এই নরকপুরীতে বাস করবো না ;—আপনি আমার অবস্থা জানেন না—থাক, তা ব’লে কাজ নাই ; এখন আমি কি করে

এ কার্য্য ত্যাগ ক'রে যেতে পারি তাই বলুন, তাই আমার করে দিন্—আপনি অনুগ্রহ করলে আমি পথ পাব।"

বড় ম্যানেজার অল্পক্ষণ স্তব্ধ ভাবে থাকিয়া বলিলেন—"আমি সব জানি, রমেশ বাবু, আমার জানতে কি বুঝতে কিছুই বাকী নাই—আমি আপনার বন্ধু জানবেন—আমি খুব বিবেচনা ক'রে দেখেছি, এক্ষণে আপনার এখানে থাকা ব্যতীত অন্য সৎ উপায় নাই; আপনার মঙ্গলের জন্যই বলছি—এখন যাওয়া যাওয়া করবেন না, তাতে কোনই ফল হবে না, যাইতেও পারবেন না মধ্যের থেকে জমিদারিনীর রোষে নানারূপ বিপদগ্রস্ত হবেন। তাই বলছি, ভগবানের নাম নিয়ে এখানেই থাকুন, অটল ভাবে কর্ত্তব্য কার্য্য করে যান, মায়াবিনীর মায়ায় মুগ্ধ হবেন না—আমি আপনাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করবো।

এই বলিয়া বড় ম্যানেজার রমেশচন্দ্রের পৃষ্ঠে হস্ত স্থাপন করিলেন।

রমেশচন্দ্র আর কিছু বলিতে পারিলেন না, আনত মস্তকে বড় ম্যানেজার বাবুর কথা গুলি মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে বিবেচনা করিয়া রমেশচন্দ্রেরও মনে হইল—যে এক্ষণে বড় বাবুর উপদেশ মত কার্য্য করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই, কারণ তিনি ভাবিয়া দেখিলেন—হাতে অতিরিক্ত একশত টাকাও নাই জমিদারিনীর যেরূপ আদেশ, তাহাতে এগ্রিম্যাণ্ট মত দুই হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ না দিয়া গেলে তিনি সহজে ছাড়িবেন না, আদালত ফৌজদারী করিয়া তাহাকে নানা রূপে দায়গ্রস্ত করিবেন।

এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিয়া একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক রমেশচন্দ্র বড় ম্যানেজার বাবুকে কাতরকণ্ঠে বলিলেন "বড় বাবু, আপনি আমার মুরুব্বি ও অভিভাবক স্বরূপ, আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, তাহাই আমার পক্ষে এক্ষণে মঙ্গলকর বলিয়া বোধ হচ্ছে, তাই আপনার কথামত আপাততঃ এখানে থাকাই মনস্থ করলাম। এখন আর আমি কাজ ছেড়ে যাব না—আপনার পায়ে পড়ে মিনতি করি, আপনি দেখবেন যেন আমি মায়াবিনীর মায়ায় কোন বিপদ্ জালে জড়িত না হই।"

"আপনি কোনও চিন্তা করবেন না, নিজে খাঁটি থাকলে কে কি করতে পারে? নিজের মনে নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যাবেন —উঁাকে দেখাও দিবেন না। ঐ দিকে যাবেন না; তাহা হইলেই আপনার আর কোন দায় হবে না। তবুও যদি মনের আক্রোশে উনি আপনার কিছু করতে চেষ্টা করেন, আমি আছি। আমি আপনাকে আড়াল ক'রে দাঁড়াবো। আমাকে আপনার বিশেষ বন্ধু ব'লে জানবেন।"

এই বলিয়া বড় ম্যানেজার বাবু ধীরে ধীরে উঠিলেন এবং অন্যান্য আর দুই একটি উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিলেন—হায়, আমার উভয় সঙ্কট, কর্ম্ম ছাড়িয়াও যাইতে পারিলাম না; আবার এখানে থাকিলেও, যখন পাপীয়সীর পাপ চোক্ষে পতিত হইয়াছি, উহার কুচক্রে যেন কি সর্ব্বনাশ ঘটে।

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার প্রাণে আকুল বেদনা উপস্থিত হইল—তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"ভগবান্, ভগবান্, আর যা হবার যেন হয়, আমাকে আমার সুনীতি হ'তে বিচ্ছিন্ন

করো না, আমাকে সুনীতির নিকট বিশ্বাসঘাতক করো না, আমার সুনীতির প্রাণে বজ্রাঘাত করো না।

অদূরে রামভজন ছিল। সে রমেশচন্দ্রের আর্ত্তস্বরে চমকিত হইয়া দৌড়াইয়া আসিল, কিন্তু রমেশচন্দ্রের ভাব পরিলক্ষণ করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইল না; কেবল ধীরে ধীরে কোমল কণ্ঠে বলিল—বাবু, আপনি অত ভাবনা করিবেন না আপনি ধার্ম্মিক, আপনার কোনও বিপদ নাই।

রমেশচন্দ্র চোখ তুলিয়া চাহিলেন কিছুক্ষণ রামভজনের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—অবশেষে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

"রামভজন, আমার বিপদ নাই। আমার যেন বোধ হচ্ছে, সহস্র বিপদ মুখ বিস্তার করে আমাকে গ্রাস করতে আসছে; আমার যা হয় হউক, আমার সুনীতির, তোমার মার যেন কিছু না হয় এই আশীর্ব্বাদ কর।"

রামভজন বড় কাতর হইল। সে ত্রস্তস্বরে বলিয়া উঠিল— "বাবু, আপনি আমার রঘুনাথজী, মা আমার সীতা লক্ষ্মী— আপনারা দেবতা, আপনাদের কিছু কেহ স্পর্শ করিতে পারিবে না।

রাম সীতার কথায় রমেশচন্দ্র চমকিয়া উঠিলেন; তাহার যেন মনে হইল—তাহাদের জীবনেও বুঝি সেরূপ ঘটনা ঘটিবে। রমেশচন্দ্রের প্রাণ কাঁপিতে লাগিল—তাহার মুখে আর বাক্য নির্গত হইল না। তাঁহার চোখের কোণে এক ফোঁটা জল আসিল।

রামভজন তাহা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইল; বলিল—বাবু,

বাবু, আপনি কোনও ভয় পাইবেন না। আমি আপনাদের চরণের দাস আছি—আমি থাকিতে আপনাদের কোন বিপদ হইবে না, আমি মহাবীরের মত আপনাদের ঢাকিয়া থাকিব।

রমেশচন্দ্র কৃতজ্ঞতা সহকারে রামভজনের প্রতি চাহিলেন—দেখিলেন, রামভজনের মুখে চোখে সাহস, তেজ, ভক্তি, অনুরাগ স্বার্থত্যাগ প্রভৃতি ভাব মিশ্রিত একটি অলৌকিক জ্যোতি নিঃসৃত হইতেছে। রমেশচন্দ্র বড় ভরসা পাইলেন, বড় আশ্বাসান্বিত হইলেন, তিনি এক দৃষ্টে ভাববিহ্বলের মত রামভজনের উদ্দীপ্ত মুখ চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

———

বিংশ পরিচ্ছেদ।

পতি যদি পড়ে পাকে—বুদ্ধিমতী নারী।
ছুটে যায় পার্শ্বে তার, লজ্জা ভয় ছাড়ি॥

তারপর চারি দিন চলিয়া গিয়াছে। রমেশচন্দ্র ইহার মধ্যে আর কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন নাই, কর্ত্রীও আর তাঁহাকে কোনও সংবাদ দেন নাই। রমেশচন্দ্র নিজমনে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইতেছেন এবং ভগবানের প্রতি চাহিয়া বিপদের আশঙ্কা হৃদয় হইতে দূরে সরাইয়া দিন অতিবাহিত করিতেছেন।

বেলা প্রায় ৯টা; রমেশচন্দ্র ডাকের প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুনীতি তাঁহার কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে পত্র পাইয়া কি লিখে, তাহা জানিতে তাঁহার প্রাণ বড় উৎসুক। কোনও রূপ ব্যতিক্রম না হইলে, আজ সুনীতির উত্তর আসিবে; তাই রমেশচন্দ্র ঘন ঘন পথের দিকে চাহিতেছেন এবং ডাকের বিলম্ব দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িতেছেন।

সহসা এক টেলিগ্রাফ পিওন দৃষ্টিগোচর হইল। রমেশচন্দ্রের একটু ভয়ের সঞ্চার হইল—তাঁহার মনে হইল, বুঝি তাঁহারই কোন টেলিগ্রাফ আছে, বুঝি সুনীতি সুস্থ নাই। তিনি ব্যাকুল ভাবে টেলিগ্রাফ পিওনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

টেলিগ্রাফ পিওন ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিল এবং টেলিগ্রাম-লেফাফা খানি তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল।

রমেশচন্দ্র যথাবিধি রসিদ স্বাক্ষর করিয়া পিওনকে বিদায় করিয়া দিলেন, পরে কম্পিত হস্তে লোকাফা খুলিলেন—দেখিলেন সুনীতি টেলিগ্রাফ করিয়াছে।

We started yesterday reached Goalundo wait Nator Station.

অর্থাৎ আমরা গত কল্য রওনা হইয়াছি, গোয়ালন্দ ঘাটে পৌছিয়াছি, অদ্য রাত্রে নাটোর ষ্টেশনে অপেক্ষা করিবেন।

টেলিগ্রাফ পাঠ করিয়া রমেশচন্দ্র বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। ভাবিলেন এ আবার কি ব্যাপার? সুনীতি এ অবস্থায় এই সময় পূর্ব্বে কিছু সংবাদ না দিয়া এখানে আসিতেছে কেন? ইহার অর্থ কি?

এইরূপ মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে হঠাৎ তাহার মনে হইল—যাক্, এখন আলোচনার আর সময় নাই, যখন আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আসিয়া পৌঁছিলেই সমস্ত বিষয় বুঝিতে পারিব। এখন বর্ত্তমানে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করা সঙ্গত। যাই বড় বাবুর কাছে, তাঁহার পরামর্শ লইয়া নাটোর যাইবার বন্দোবস্ত করা আবশ্যক। বোধ হয় দার্জ্জিলিং মেল ধরিয়াই আসিবে। তা হইলে, দুপুরের পরেই যাহাতে নাটোর রওনা হইতে পারি, তাহা করা কর্ত্তব্য। আমি নিজেই যাইব, অন্য লোক পাঠাইলে চলিবে না।

এইরূপ ভাবিয়া রমেশচন্দ্র টেলিগ্রামটি লইয়া বড় ম্যানেজার বাবুর বাসায় গেলেন। বড় ম্যানেজার বাবু তখন বাসায়ই ছিলেন।

রমেশচন্দ্র বড় ম্যানেজার বাবুকে টেলিগ্রামটি দেখাইলেন

এবং তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন—বড় বাবু, আমি ত' ইহার কোন কারণই বুঝতে পারছি না, ওঁরা যে এই সময় এই ভাবে কেন আসছেন তার অর্থ কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

বড় ম্যানেজার বাবু, টেলিগ্রামটি পাঠ করিয়া কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'আপনাব স্ত্রী নিরতিশয় বুদ্ধিমতী; তিনি এখন কেন আসছেন আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি বোধ হয় কর্ম্ম ত্যাগের কথা এবং কি কারণে কর্ম্ম ত্যাগ করছেন, তাহাও বোধ হয় আভাসে লিখেছিলেন। তাই তিনি আপনার এই সময় কর্ম্ম ছাড়া উচিত নয়, এবং যে কারণে আপনি কর্ম্ম ছাড়তে চচ্ছেন, তিনি স্বয়ং এখানে থাকলে, সে কারণ দূরীভূত হ'তে পারে ইহা মনে করে তিনি চলে আসছেন। রমেশবাবু, আপনার স্ত্রী সে অতিশয় বুদ্ধি শালিনী এবং নিতান্ত বুদ্ধিশালিনীর ন্যায় কাজ করছেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সে যাই হউক, এখন আর সে সব ভাববার সময় নাই,—আপনি নিজেই দুপ্রহরে আহারের পর আমাদের ষ্টেটের গাড়ীতে নাটোর চলিয়া যান। আপনার নিজেরই যাওয়া উচিত; আপনি যেয়ে তাদেব সঙ্গে করে নিয়ে আসুন। আমি ষ্টেটের গাড়ী দেবাব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি

রমেশচন্দ্র ঐরূপ পরামর্শে স্বীকৃত হইয়া বাসায় ফিরিলেন ও দুপ্রহরের পর নাটোর যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দুপ্রহরের পর যথা সময়ে জুড়িগাড়ী সজ্জিত হইয়া রমেশ-চন্দ্রের বাসার সন্নিকট দাঁড়াইল। রমেশচন্দ্র আহারাদি সমাপনান্তে ক্ষণিক বিশ্রাম করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। রামভজনও সঙ্গে গেল। বলবান অশ্বদ্বয় গাড়ী লইয়া ঝড়ের মত নাটোর অভি-মুখে ধাবিত হইল।

নাটোর সেখান হইতে প্রায় ২০ মাইল পথ। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে রমেশচন্দ্রকে লইয়া জুড়িগাড়ী নাটোর ষ্টেশনে পৌছিল। তখন দার্জ্জিলিং মেল আসিতে বহু বিলম্ব। রমেশচন্দ্র ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত দেখা করিয়া এবং গাড়ী কখন আসিবে জানিয়া লইয়া ওয়েটিং রুমে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। রামভজন অদূরেই আছে—কখনো কখনো সে পান আনিয়া বাবুকে দিতেছে, রমেশচন্দ্র তাহা খাইতেছেন এবং ঘড়ি ধরিয়া অসহিষ্ণুভাবে—গাড়ীর সময়ের অপেক্ষা করিতেছেন।

সময় যেন বড়ই ধীরে ধীরে যাইতেছে, ঘড়ির কাটা যেন চলিতে চাহিতেছে না। তবুও, যাহোক, ক্রমে সময় কাটিতে লাগিল। সময়—নিজের গতিতে কাহারও দিকে না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে; মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর পর পর চলিয়া যাইতেছে—এতো সামান্যকাল, এতো যুগেই। আমাদের নিজ নিজ গরজ মতে সময়ের গতিকে ধীরই মনে করি, আর দ্রুতই মনে—সময় যাইতেছে, যাইবে—একভাবেই যাইবে।

সে যাহাই হউক—সময় কাটিয়া গেল—মেল আসিবার ঘণ্টা পড়িল—কতক্ষণ পরে হোঁস্ হোঁস্, ঝপ্ ঝপ করিতে করিতে বিপুলকায় দার্জ্জিলিং মেল ষ্টেশনগৃহ, প্লাটফর্ম্ম কম্পিত করিয়া আসিয়া যথাস্থানে দাঁড়াইল। লোকের শ্রেণী নামিতে লাগিল—কেহ উঠিতে লাগিল। রমেশচন্দ্র সেই লোক স্রোত ঠেলিয়া গাড়ী গাড়ী খুঁজিতে লাগিলেন।

খুঁজিতে খুঁজিতে রমেশচন্দ্রের সহিত তাহার সম্বন্ধী বিপিনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হইল। বিপিন সুনীতির জ্যেষ্ঠ ভাই। তিনি রমেশ-

চন্দ্রকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—'এসেছেন? চলুন, সুনীতি মেয়েদের গাড়ীতে আছে।

উভয়ে দৌড়াইতে দৌড়াইতে মেয়েদের মধ্যমশ্রেণীর গাড়ীর নিকট যাইয়া দরজা খুলিল। সুনীতি তাহাদের দেখিয়া মাথায় ঘোমটা টানিয়া গাড়ী হইতে ধীরে ধীরে নামিলেন।

তারপর মুটিয়ার মাথায় বাক্স বিছানাদি দিয়া তাঁহারা ষ্টেশন ছাড়িয়া চলিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিরহে মিলন অতি রসাল মধুর,
জানেন যাঁহারা হন প্রেমিক চতুর॥

রাত্রি প্রায় দেড় ঘণ্টা দুই ঘণ্টা থাকিতে রমেশচন্দ্র সুনীতি প্রভৃতিকে লইয়া বাসায় পৌঁছিলেন। বাসায় আহারাদি প্রস্তুত ছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সকলে আহার করিলেন। পরে নিদ্রার জন্য শয্যায় আসিলেন। রাত্রি আর অধিক নাই—নিদ্রা অতিক্রমণ হইবে না—অথবা রাত্রি জাগরণে শরীর অসুস্থ হইবে মনে করিয়া সকলে ত্রস্ত হস্তে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয্যায় আসিলেন।

রমেশচন্দ্র নিদ্রার জন্য অধিক ব্যস্ত ছিলেন না—তিনি তাড়াতাড়ি করিলেন কারণ তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কত মাস পর সুনীতির সহিত সাক্ষাৎ, প্রণয়িনীর প্রণয় আস্বাদে কতদিন পর্য্যন্ত বঞ্চিত আছেন—তারপর নানা বিষয়ে কত কথার দরকার আছে;—তাই তিনি সুনীতিকে আপনার কাছে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। গাড়ীর মধ্যে সম্বন্ধীর সাক্ষাতে স্ত্রীর সহিত কোনও বিষয়ে আলাপ করিতে পারেন নাই—বাসায় পৌঁছিয়াও এতক্ষণ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন কথা নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হন নাই।

রমেশচন্দ্র শয্যায় আসিয়া বসার কিছুক্ষণ পরেই সুনীতি কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর পতি পত্নী সাক্ষাৎ হইল।

উভয়ে বহুক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকিয়া পরস্পরের অধর সুধা পান করিয়া তপ্ত হৃদয়ে শান্তি প্রলেপ দিলেন। তারপর রমেশচন্দ্র পত্নীর মুখ নিজ বক্ষ হইতে উত্তোলন করিয়া কোমল গণ্ডে আবেগভরে একটি চুম্বন দিয়া বলিলেন—"তোমরা হঠাৎ এই ভাবে এই সময় কেন এলে—অন্য বিষয় শুনবার আগে—ইহাই আমার জানতে নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মেছে—আমায় তাই বল—আমার চিন্তার কারণ দূর হোক।" সুনীতি স্বামীর চোখে চোখে কতক্ষণ প্রেমপূর্ণ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া—ঈষৎ সহাস রোষ ভরে বলিলেন—"আসবো না ? বেশ কথা—আমি দূরেই পড়ে থাকবো নাকি ? আমি তোমায় ছেড়ে থাকতে পারি ? এতদিন যে ছিলাম, সে কত কষ্টে, কত অনিচ্ছায়। আমার আসবার অধিকার আছে, তাই এসেছি।

প্রেমময় স্বামী প্রেমময়ী পত্নীর অভিমান ভরা কথায় বড়ই প্রীতিলাভ করিলেন। প্রেমভরে প্রণয়িনীর গণ্ড টিপিয়া বলিলেন—"বাপরে বাপ, কত কথা ব'লে ফেললে। সুনীতি প্রেয়সি—এমন সুন্দর প্রাণ মাতানো কথা ত' পূর্ব্বে আর শুনি নাই। সুনীতি, তুমি আমার যথার্থই সুনীতি। সে যাক্, বাস্তবিকই আমার প্রাণ বড় কৌতুহল হয়েছে—বল একবার বিস্তার করে বল—কেন হঠাৎ কি পরামর্শ ক'রে এই ভাবে চলে এলে।

সুনীতি তখন স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন। আমি তোমার চাকরী ত্যাগ করতে সঙ্কল্প করবার চিঠি পেলাম। পেয়েই শিহরিয়া উঠলাম। আমার মনে হলো—তোমার এক্ষণে চাকরী ত্যাগ করা কোনও মতেই সঙ্গত নয়। আমার নানা কারণে এইরূপ মনে হলো। প্রথমতঃ

আমাদের বর্ত্তমানে যে একটু অবস্থা ফিরেছে, তা এই চাকরী হতেই, দ্বিতীয়তঃ, এই চাকরী ছাড়লে আবার এরূপ চাকরী যোগাড় করা হয়তো অসম্ভব হবে—আবার হয়তো উপায়ান্তর না পেয়ে ওকালতী আরম্ভ করতে হবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় পসারের অভাবে অর্থচিন্তায় পড়ে হা-হুতাশে শিরঃব্যাধির কবলে পড়তে হবে। তবে এসব কারণ আমায় তত ভীত করতে পেরেছিল না --আমার প্রধাণ ভয়ের কারণ হয়েছিল—যে তুমি দুই হাজার টাকার এগ্রিমেণ্ট দিয়েছ, কাজ ছাড়লে সেই টাকা পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, তাহা তুমি কোথা হ'তে পাবে? যদি তুমি ক্রোধের বশীভূত হয়ে পরিণাম বিবেচনা না ক'রে চাকরী ইস্তফা দিয়ে বস, তবে যে জমিদারীনীর বামানল ক্রোধানলে পরিণত হয়ে তোমাকে ভস্ম করতে পশ্চাদ্ধাবিত হবে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন আমাদের উপায় কি হবে? অবশ্য আমার গৌরবের ও ভাগ্যের তুলনা নাই যে তোমার ন্যায় চরিত্রবান্, উচ্চহৃদয় পুরুষকে আমি পতিরূপে পেয়েছি তথাপি আমার মনে হলো-- যে যদি চরিত্রে খাটি পবিত্রতা থাকে, হৃদয়ে যথার্থ বল থাকে তবে কি একটা রমণী—হাজার সুন্দরী হউক, হাজার ধনশালিনী হউক—তাহার মোহিনী শক্তিতে অভিভূত করতে পারে?—তাহা কখনই পারে না। যদি তা না পারে—তবে কার্য্য ত্যাগ, এই কাপুরুষতা কেন—এই আত্মপ্রতি অবিশ্বাস কেন? তাই মনে মনে স্থির করলাম—আমার স্বামী দেবতা, তাঁহার চরিত্রবল অসীম ও অচিন্তনীয়, তাঁহার পদস্খলন কিছুতেই হবে না। তবে অকারণ একটি মুহূর্ত্তের ভ্রমে আমরা পুনরায় দুরবস্থায় পড়ি কেন? তাই ভাবলাম—আমি চলে যাই, আমার কথায় তুমি বুদ্ধিস্থির করবে

এবং চাকরী ত্যাগের সঙ্কল্প ছাড়বে। আমি আরও ভাবলাম—যদি আমি তোমার কাছে থাকি, তবে মায়াবিনার লোলুপদৃষ্টি আর তোমার উপর থাকবে না, তুমিও সুস্থচিত্তে নিজ কর্ত্তব্য করতে পারবে। এই সব মনে মনে ভেবে ও চিন্তা করে চলে এসেছি—কিছু কি অপরাধ করেছি?

পত্নীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া—রমেশচন্দ্রের প্রাণ আনন্দাপ্লুত হইল। তিনি সাদরে প্রিয়তমার ললাটে ও গণ্ডে গাঢ় চুম্বন দিয়া বলিলেন—"সুনীতি, তুমি অপরাধ করেছ? না, আমি তোমার মত সতীসাধ্বী—তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী পত্নী পেয়েও তোমার মতের অপেক্ষা না করে যে কার্য্য ছাড়তে মানস করেছিলাম, তজ্জন্য আমিই আমাকে অপরাধী মনে করছি। ভাগ্যে বড় ম্যানেজার বাবুর মত হিতৈষী বান্ধব ও মুরুব্বি আমার ছিল—নতুবা মুহূর্ত্তের বুদ্ধির দোষে আজ আবার আমাদের পথে দাঁড়াতে হতো। তোমার স্থিরবুদ্ধিতে ও বিচার শক্তিতে বিমোহিত হয়েছি। তুমি যে এই অল্প সময়ের মধ্যে, এইরূপ অভাবনীয় বিপদের আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধি স্থির রেখে সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করে এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছ এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে এতদূর চলে এসেছ—ইহাতে তোমার চরিত্রের ও বুদ্ধির প্রশংসা না করে থাকতে পারছি না। আমি চিরদিনই তোমার গুণে মুগ্ধ, আজ আরও মুগ্ধ হলাম।"

সুনীতি যেন কিছু লজ্জিত হইল—সে রমেশচন্দ্রের পায়ের কাছে মাথা লুটাইয়া বলিল—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার পত্নী, তোমার মঙ্গলে আমার মঙ্গল, আমার মঙ্গলে তোমার মঙ্গল। তুমি তরু, আমি লতা, আমি চিরজীবন সর্ব্বদা তোমাকে

ভর করে আছি, থাকবো—সময় বিশেষে যদি আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে বিপুল ঝড় ঝঞ্ঝার সময়, তোমাকে অটল রাখতে না পারি, তবে আমার জীবনের সার্থকতা কোথায়—তবে আমি অর্দ্ধাঙ্গিণী নামের কি চরিতার্থতা করিলাম।

তারপর স্বামীস্ত্রী নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিল। সে আলাপের কি শেষ আছে? এতদিন পরে দেখা—প্রাণভরা কথা, প্রাণভরা বিরহ-বেদনা।

কথা বলিতে বলিতে রাত্রি শেষ হইয়া গেল। বিহঙ্গ কাকলিতে বৃক্ষকুল মুখরিত হইয়া উঠিল। জানালা রন্ধ্রে উষালোক উঁকি মারিতে লাগিল। কতক্ষণে চাকর চাকরাণীর নিদ্রাত্যাগ পূর্ব্বক কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত হওয়ায় সাড়াশব্দ পাওয়া গেল—রমেশচন্দ্র ও সুনীতি পরস্পরকে প্রণয় চুম্বন করিয়া—ইষ্টনাম স্মরণ করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হইলেন।

সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাদেবীও আর প্রণয়ী যুগলের স্থানে থাইব না, তাহাদের নিকট আমার আদর অভ্যর্থনা একেবারেই নাই—মনে মনে এইরূপ শপথ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

সংসারে আপন দোষ কেহ নাহি দেখে,
ভাবে হেন সবে হয়—যদি পড়ে পাকে।

যথাসময়ে জমিদারিনী সুনীতির আগমনবার্ত্তা শুনিলেন। তিনি জানিতে পারেন নাই যে সুনীতি স্বয়ং নিজ প্ররোচনায় চলিয়া আসিয়াছেন—তা'ই তিনি মনে করিয়া বিশ্বাস করিলেন যে রমেশচন্দ্রই তাহাকে বাড়ী হইতে আনাইয়াছেন। প্রত্যেক কর্ম্মেরই একটি উদ্দেশ্য আছে—এবং এই আনা ব্যাপারের কি উদ্দেশ্য, তাহারও একটা সিদ্ধান্ত কর্ত্রী ঠাকুরাণী মনে মনে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলেন। তিনি মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন—এগ্রিমেণ্টের টাকার ভয়ে রমেশচন্দ্র কার্য্য ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না—আমার চাকরীতেই থাকিতে বাধ্য হইল, কাজেই পাছে আবার আমি তাহাকে আহ্বান করি, কি কোন রকমে বশীভূত করিতে চাই, সেই ভয়ে আপন পত্নীকে আনিয়া কাছে রাখিল।

কর্ত্রী একাকিনী প্রাতঃকালে আপন কক্ষে বসিয়া এই সব কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন। আন্দোলন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয় সমুদ্রে নানারূপ তরঙ্গ উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। রমেশচন্দ্রের প্রতি ব্রহ্মময়ীর আকর্ষণ একটা চোখের নেশা কি সাময়িক মোহের টান ছিল না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একটা যথার্থই ভালবাসার আশক্তির ন্যায় প্রবল মানসিক আকর্ষণ

জন্মিয়াছিল; তাই তিনি রমেশচন্দ্রের উপেক্ষাকে হেলায় উড়াইয়া দিতে পারিতেছিলেন না। যতই সেই মানিনী দর্পিতা রমণী রমেশচন্দ্রের প্রত্যাখ্যানকে উপেক্ষার নেত্রে দেখিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, ততই রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অনুরাগ প্রবল হইয়া হৃদয় সাগরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল এবং ততই সেই তরঙ্গ ভঙ্গে অনুরাগপুঞ্জ ভাঙিয়া চুরিয়া আক্রোশে ও প্রতিহিংসায় পরিণত হইতেছিল।

ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মময়ীর সমস্ত আক্রোশ ক্রোধ-বহ্নি সুনীতির প্রতি ধাবিত হইল। তিনি এমন উচ্চপদস্থা বিভবশালিনী রমণী হইয়া—এবং যাহার প্রণয় ভালবাসা লাভ করিলে তুচ্ছ রমেশচন্দ্রের মত লোক কেন কত ধনী ও ভাগ্যবান পুরুষ নিজেকে ধন্য মনে করিত, এইরূপ রমণী হইয়া—স্বতঃ প্রেম যাচিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু রমেশচন্দ্রের এমন চরিত্র গর্ব্বের মোহ যে তাঁহার প্রেমকে তুচ্ছ করিয়া তাঁহাকে অপমানিত ও হতাভিমান করিল। তাহাকে এই দর্পের উপযুক্ত দণ্ড দিতেই হইবে। যে স্ত্রীর প্রেমে ভরপূর মুগ্ধ থাকিয়া, যে পত্নীর সতীত্বের গৌরবে স্পর্দ্ধিত হইয়া রমেশচন্দ্র তাঁহাকে এত তাচ্ছিল্যভরে নিক্ষেপ করিল, তাঁহার মদগর্ব্বিত হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া, সেই রমণীর সর্ব্বনাশ সাধন করিতে হইবে. তাহার সতীত্ব গর্ব্বকে চূর্ণ করিতে হইবে এবং তদ্রূপ করিয়া রমেশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে রমণীমাত্রই ঘটনার দাসী, যে রমণী অবস্থার বিবর্ত্তনে সতী কি অসতী থাকে।

মানব চরিত্রের ইহা একটি গূঢ় রহস্য। নিজে যেরূপ, অপরকে সেরূপ অনুমান করা, এবং তাহার অবস্থায় পড়িলে যে প্রত্যেকেই তাহার ন্যায় চরিত্র ও ভাব লাভ করিত এইরূপ বিশ্বাস করিয়া

আপনার কলুষ চরিত্রের একটা কৈফিয়ত দাঁড়া করা প্রত্যেক দুষ্ট নরনারীর স্বাভাবিক চেষ্টা। মানুষ যতই পাপী ও পতিত হউক না কেন, সকলেরই নিজ চরিত্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে একটা চেতনা থাকে এবং সেই চেতনা হইতে মানসিক পীড়ায় জর্জ্জরিত হয়। তাই যেমন দুঃখী দুঃখীকে দেখিয়া, শোকী শোকীকে দেখিয়া প্রাণে শান্তি আনিবার চেষ্টা করে তদ্রূপ পাপীরাও উৎকৃষ্ট চরিত্র সম্পন্ন ব্যক্তি দিগের দোষ দেখাইয়া এবং তাহাদিগের চরিত্রে কলঙ্কলেপ করিয়া তাহাদিগকে নিজ শ্রেণীভুক্ত করিয়া আপনাদিগের শান্তি বিধান করিতে যত্নবান হয়। মানুষ সহজে নিজেকে অন্য অপেক্ষা হেয় বা নিকৃষ্ট স্বীকার করিতে চায় না।

সে যাহা হউক, ব্রহ্মময়ী সুনীতির সর্ব্বনাশ করিতে স্থির-সঙ্কল্প হইলেন। কিন্তু, কি উপায়ে তাহা সম্পন্ন করা যাইবে তাহাই তাঁহার চিন্তা ও মন্ত্রণার বিষয় হইল। তিনি মনে মনে নানা উপায় কৌশল আলোচনা করিতে লাগিলেন—এখন হইতে ঐ চিন্তাই তাহার হৃদয় স্থল অধিকার করিয়া রহিল। প্রতি-হিংসাময়ী রমণীর মস্তিষ্কে আগুন ধাঁ ধাঁ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

তারপর দুই তিন দিন চলিয়া গেল। চতুর্থ দিন প্রাতে জমিদারিনী নিদ্রা হইতে উঠিয়া নিজের অনুগতা ও বিশ্বাসী দাসী বামাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বামা উপস্থিত হইলে—বলিলেন, বামা, তোর সঙ্গে একটা বিশেষ মন্ত্রণা আছে, দরজাটা বন্ধ করে আয়।

বামা যদিও সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝিল না—এই পর্য্যন্ত বুঝিল যে একটা কিছু গুপ্ত কার্য্যের পরামর্শ আছে; কারণ সেইই

ব্রহ্মময়ীর গুপ্ত কার্য্যের প্রধান সহায় ও দূতী। তাই একটু মুচকি হাসিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে কর্ত্রীর পাশে আসিল।

দুই জনে সেই রুদ্ধ কক্ষে বহুক্ষণ পরামর্শ হইল, কি হইল আমরা এক্ষণে বলিতে অক্ষম।

তিন চারি ঘণ্টা মন্ত্রণা ও পরামর্শের পর বামা দাসী পুনবায় দরজা উদ্ঘাটন করিল এবং সেই সময় তাহার শেষ কথাটা যাহা শোনা গিয়াছিল তাহা এই—মা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার অনুমতি পেলে পূর্ণিমার চাঁদকে অমাবস্যার আঁধারে ঢাকতে পারি —এতো একটা সমান্য বিষয়—একটা দুর্ব্বলা আমাদের মতই রক্ত মাংসের গড়া মেয়ে মানুষ।

বামী গর্ব্বভরে হেলিতে দুলিতে বহু পুরস্কারের লোভে উৎফুল্ল ঢল ঢল হাসিমাখা মুখে চলিয়া গেল। কর্ত্রী এত দিন পরে একটা পথের উদ্ভাবনা হইয়াছে—এই স্বস্তিতে বিশেষ সুস্থ চিত্ত হইয়া ঐ কক্ষের এক গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া যে উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে যে কার্য্য সিদ্ধি হইবে, মনের আগুন নিভিবে—এইরূপ কল্পনা ও বিশ্বাস করিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ দেখিলেন একটি গৃহ ছাদে একটী রমণী—যুবতী-বসিয়া চুল শুকাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—রমেশচন্দ্রের বাসা-বাড়ী জমিদার বাড়ীর অনতি-দূরে অবস্থিত। জমিদারিনীও জানিতেন যে ঐ ছাদ রমেশচন্দ্রের বাসা-বাড়ীর। কাজেই তাঁহার আর বুঝিতে বাকী রহিল না—যে ঐ যুবতী আর কেহ নহে, রমেশচন্দ্রের স্ত্রী। তিনি দেখিলেন—রমণীটি কি সুন্দরী, কি

লাবণ্যময়ী;—ইহা দেখিবা মাত্র তাঁহার হৃদয়ের হুতাশন্ যেন আরও প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল—তাঁহার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হইল, যে ঐ রূপের গরিমা ভাঙ্গিতেই হইবে,—ঐ গৌরী মূর্ত্তিকে কালী মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া রমেশের দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

শিকার ধরিতে যদি ব্যাঘ্রী ক্ষিপ্ত হয়।
শৃগালের পায়ে পড়ি সহায়তা লয়॥

সেইদিন রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময়—বামাদাসী একটি প্রায় ত্রিংশ বর্ষ বয়স্ক যুবককে লইয়া কর্ত্রীর কক্ষ সমীপে উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিক নীরব,—সেদিন রাত্রিটা কিছু মেঘাচ্ছন্ন ছিল—আকাশ ভুবন অন্ধকারে ভরা, সেই নিস্তব্ধ সময়ে কর্ত্রী নৈশ আহারাদি শেষ করিয়া দাসদাসীদের সেই রাত্রির মত বিদায় দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপন কক্ষে বসিয়া আছেন—মনে মনে নানারূপ চিন্তা করিতেছেন—এমন সময় দ্বারে মৃদু করাঘাত পড়িল। কর্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন—বামা সেই যুবকটি সহ কক্ষে প্রবেশ করিল। যুবকটি সসম্ভ্রমে কর্ত্রীকে অভিবাদন করিল। বামা বলিল—'মা, ইনিই আপনার সুমারনবিশ মনোমোহন বাবু। কর্ত্রী দেখিলেন—তাহার সুমার নবিশটি বেশ কায়দা দুরস্ত সৌখীন যুবক—গৌরবর্ণ, সুন্দর গঠিত মুখচোখ—চমৎকার তরঙ্গায়িত টেরী বিভিন্ন কেশগুচ্ছ—বেশ রুচি সম্পন্ন সাজ পোষাক। তিনি প্রীত হইলেন—তাঁহার ভরসা হইল—ইহার দ্বারা কার্য্য উদ্ধার হইবে।

কর্ত্রী মনোমোহনকে বসিতে বলিলেন। সে নিঃসঙ্কোচে সম্মুখস্থ একখানা চেয়ারে বসিল—সেই সময় তাহার গাত্র হইতে বেশ একটু খোসবাই কর্ত্রীর নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল—এবং সঙ্গে

সঙ্গে যুবকের নিশ্বাস বায়ুব সহিত মিশ্রিত, বোধ করি আর একটা কিছু অন্য রকমের গন্ধ কর্ত্রীর নাসিকায় পৌঁছিয়াছিল—তাই বুঝি তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন। সে যাই হোক, মনোমোহন উপবেশন করিলে, কর্ত্রী বলিলেন,—মনোমোহন বাবু আপনি বোধ হয় সমস্ত বিষয় বামার মুখে শুনেছেন। আপনি কি এ কার্য্য সম্পন্ন করতে পারবেন ?

মনোমোহন সমুচ্‌কি হাসিয়া বলিল—"হাঁ, আমি সব শুনেছি। আপনি যদি আমার সহায় হন, এতো সামান্য কাজ।"

"হাঁ, আমি নিশ্চয়ই আপনার সম্পূর্ণ সহায়তা করবো।"

"তবে আমার আর সে কার্য্য সাধন কবিতে বিলম্ব লাগবে না।"

কর্ত্রী প্রফুল্লা হইলেন—মনোমোহনের প্রতি প্রীতিভরে চাহিয়া বলিলেন—"সুখী হলাম। বলুন, আপনি এখন কি চান ? সম্প্রতি আমার কিরূপ সাহায্য করতে হবে—আমি কি করলে, আপনি কার্য্যে অগ্রসর হতে পারেন ?

মনোমোহন পূর্ণ দৃষ্টিতে কর্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া, ক্ষণকাল ভাবিয়া বলিল—"আমি আজ বিশেষ কিছু বলতে পারি না, কারণ ও বিষয়ে এখনও ভেবে দেখি নাই। দু চার দিন একটু চিন্তা করে দেখি—তারপর আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবো।

কর্ত্রী বলিলেন—"তা বেশ, বুঝে দেখুন। খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে, যেন আমার উদ্দেশ্যও সাধিত হয়, অথচ আপনি যেন কোন বিপজ্জালে জড়িত না হন এবং আমি যেন কলঙ্কে না ডুবি।"

"না মা, ইনি বড় চতুর লোক, ইনি খুব সাবধানে কার্য্য

সমাধা করতে পারবেন।" এই বলিয়া বামা একটু সহাস অপাঙ্গে মনোমোহনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

মনোমোহন তাহার বাক্যে উৎসাহিত হইয়া আত্ম গরিমায় একটু হাসিল।

কর্ত্রীও হাসিয়া বলিলেন—"কার্য্যসিদ্ধি করতে পারলে, মনমোহন বাবু, আপনার সর্ব্বকমেই লাভ। আমা হতে যথেষ্ট পুরস্কারও পাবেন, আবার একটী সুন্দরীর প্রণয়ও লাভ হবে।

"আমি আপনার প্রসাদই অধিক মুল্যবান জ্ঞান করি।" এই বলিয়া মনোমোহন কর্ত্রীর মুখের উপর নয়ন স্থাপন করিল।

কর্ত্রীর চক্ষু উহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইল—কর্ত্রী দেখিলেন—তাহার দৃষ্টি আকাঙ্খাময়, যেন সেই দৃষ্টি তাহার হৃদয়-নিহিত উচ্চতর আশাকে ফুটাইয়া দিতেছে। কর্ত্রীর কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ বোধ হইল, কিন্তু তিনি অপ্রীত হইলেন না, বরং সেই দৃষ্টি তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের কোন অংশ রসান্বিত করিল। তাই আনত নয়নে, অনুচ্চস্বরে বলিলেন—বটে? যদি আপনি পূর্ণ মনোস্কাম হতে পারেন, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারেন, আমার সম্পূর্ণ প্রসাদই লাভ করবেন।

'আচ্ছা, এই আশ্বাসই আমাকে সর্ব্বদা সমুৎসাহিত করবে।" বলিয়া মনোমোহন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বলিল—"তবে এখন উঠি, রাত্রিও বেড়ে উঠলো।'

"আচ্ছা, যান—আমাকে শীঘ্রই জানাবেন, আমার সম্প্রতি আপনাকে কি সাহায্য করতে হবে। যা, বামা, মনোমোহন

বাবুকে অতি গোপনে বাহিরে রেখে আয়, দেখিস্ কেউ যেন দেখে না।

"মা, তা আমায় আর বলতে হবে না।" বলিয়া বামা মনোমোহনকে অগ্রে করিয়া বাহির হইয়া গেল। কর্ত্রী দরজা বন্ধ করিয়া শয্যায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। কর্ত্রীর সহজে নিদ্রা আকৃষ্ট হইল না। বিবিধ চিন্তায় তাঁহার অন্তঃকরণ আন্দোলিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে যেন আর পূর্ব্বমত আনন্দ ও উৎসাহ নহে। রমেশ চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হওয়া অবধি তাঁহার জীবন নাটকে একটা নূতন অঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে। তিনি নানারূপ ভাবের আবেগে নানারূপ চিন্তার আবর্ত্তনে ঘুরিতেছেন। পূর্ব্বে তাঁহার জীবনধারা তরঙ্গবিহীন একটা শিথিল স্রোতে বহিয়া আসিতেছিল। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া, বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া, স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া, এক রকম বেশ শান্তিতেই জীবন যাপিয়া আসিতেছিলেন। অর্থের অভাব ছিল না, মনের মধ্যেও ধর্ম্মভয় ও লোক লজ্জার আতঙ্ক বড় একটা ছিল না;—কাজেই যখন যেরূপ সাধ জন্মিয়াছে, তাহা বড় অপূর্ণ থাকে নাই। আকাঙ্খার অতৃপ্তি হইতেই জীবনের যত দুঃখ ও কষ্ট। মানবের হৃদয় দুই রকমে তৃপ্তি লাভ করে। এক আকাঙ্খার পরিশূন্যতায়, আর এক আকাঙ্খার পরিপূর্ণতায়! যাহারা আকাঙ্খার বশীভূত নয়, তাহারা কোনও অতৃপ্তি জানে না; তাহারা সকল অবস্থাতেই তুষ্ট। যাহাদের নানারূপ আকাঙ্খা, তাহারাই সুখ দুঃখের দাস হইয়া পড়ে—সাধের পূর্ণতায় তাহারা সুখী হয়; এবং অপূর্ণতায় দুঃখী হয়। কিন্তু, ইহাও সত্য, যাহারা আকাঙ্খার অধীন,

তাহারা রাজরাজ্যেশ্বর হইলেও সুখী হইতে পারে না, কারণ আকাঙ্খার সীমা নাই, কাজেই তৃপ্তি নাই।

কর্ত্রী ব্রহ্মময়ী আকাঙ্খার, কামনার দাসী। পূর্ব্বে তাঁহার যে সব আকাঙ্খা জাগিয়া উঠিত তাহার কতক পূর্ণতা হইত বলিয়া তিনি এ যাবৎ নিজেকে তত দুঃখী মনে করেন নাই। অধুনা তাঁহার একটি অননুভূতপূর্ব্ব অভাব বোধ জন্মিয়াছে। তাঁহার প্রাণে এতদিন রমণীর চরিত্রসুলভ প্রেমাকাঙ্খা জাগরিত হইয়াছিল না। তিনি ঐশ্বর্য্যের ও পদগৌরবের মদিরাবেশে বিহ্বল হইয়া ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে রমেশচন্দ্রের সাক্ষাতে তাঁহার হৃদয়ে একটা প্রবল প্রেম-পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি তাহাকে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছেন না। তাহার উচ্ছৃঙ্খল হৃদয় সেই তৃষ্ণার তৃপ্তি চায়—কিন্তু তৃপ্তি ত হইতেছে না। তাই তিনি বড় অসুখী হইয়া পড়িয়াছেন, তাই তাঁহার আর সেই আনন্দ কি উৎসাহ নাই। তিনি নিরন্তর সেই হতাশার, অতৃপ্তির জ্বালাময় বিষে জর্জ্জরিত হইতেছেন। আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না। তাই বিকৃতমনার ন্যায় সেই পিপাসার তৃপ্তি, সেই জ্বালার নিবারণ অন্য-ভাবে খুঁজিতেছেন। প্রতিহিংসা করাও এক রকম তৃপ্তি—এক প্রকারের আনন্দ। সাধনার ধারা দুইটা—একটি মিত্রতা করিয়া, অপরটি শত্রুতা সাধিয়া। মিত্রতা করিয়া সাধনার ধনকে হস্তগত করিতে পারিলেই তাহা যথার্থ প্রীতিপ্রদ ও আনন্দদায়ক হয়। যখন তাহা অসম্ভব হয়, তখন বিপরীত পথে, শত্রুতা সাধন করিয়া—সাধনার দেবতাকে, অরিরূপে সম্মুখীন করিতে পারিলে—তাহাকে জ্বালা দিয়া নিজে জ্বালা পাইলেও যে প্রাণের তৃপ্তি হয়। তাই আজ ধনমান-

পদগর্ব্বে গর্ব্বিতা বিপুল সম্পদশালিনী, অভিমানিনী জমিদারিনী ব্রহ্মময়ী প্রেমের কুহকে আবিষ্ট হইয়া একটা সামান্য, দরিদ্র, নিজ অধীনস্থ যুবকের শত্রুতা সাধনা করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। হায়, প্রেমের শক্তি কি অসীম—প্রেমের কার্য্য কি রহস্যময়। প্রেমে মানুষ দেবতা হয়, প্রেমে মানুষ রাক্ষসও হয়।

চতুরিংশ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি লোভী নর দুরাকাঙ্খা বশে
অধর্ম্ম করিতেও নাহি ডরে,
হিতাহিত না ভাবিয়া হয়ে আত্মহারা
অসাধ্য সাধিতেও সাধ করে!

মনোমোহন কটিতে কাপড় আঁটিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার আশা উচ্চ। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য—সুনীতিকে লাভ করা নয়, তাহার উদ্দেশ্য কর্ত্রীর অনুগ্রহ লাভ করা। তাহার বিশ্বাস—বড় ম্যানেজার বাবু কর্ত্রীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াই প্রধান কর্ম্মচারী হইয়াছেন। তাই, যদি সে কোনও মতে কর্ত্রীর হৃদয় অধিকার করিতে পারে, তবে সেও কালে বড় ম্যানেজারী পাইতে পারিবে। সেই আশায় ও আকাঙ্খায় মনোমোহন উৎসাহিত হইল এবং কর্ত্রীর অভীষ্ট কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কি উপায়ে অগ্রসর হওয়া যায়?

রমেশচন্দ্র তাহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী, সুনীতি তাঁহার পত্নী; কি করিয়া তাহার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, কি উপায়ে তাহাকে প্রলুব্ধ করিয়া পতিতা করিতে হইবে? কার্য্য বড় সহজ নয়, বিশেষ বিপদও আছে। কিন্তু মনোমোহন আশার উন্মাদনায় এক রকম জ্ঞানশূন্য—সে কোন বিপদ-ভয়ে পশ্চাৎপদ হইল না,—সে সুযোগ খুঁজিতে লাগিল।

যে যাহা চায়, ভগবান্ অনেক সময় তাহা দেন,—কাহাকেও

দণ্ড স্বরূপ, কাহাকেও পুরস্কার স্বরূপ। মনোমোহন যে সুযোগ চাহিতেছিল—কিছুদিনে ঘটনাক্রমে সে সে সুযোগ পাইল।

বৈশাখ মাস, ভয়ঙ্কর গরম, পশুপক্ষী কীটনুয় অসহ্য গ্রীষ্মে ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। এই সময় একদিন আহারান্তে রমেশচন্দ্র কাছারীতে আসিলেন—প্রায়ই মধ্যাহ্নে বড় ম্যানেজার কি রমেশচন্দ্র কাছারী আসিতেন না, অন্যান্য কর্ম্মচারীরা আসিয়া তাহাদের বাকী পড়া কার্য্যগুলি সারিয়া ফেলিত। সেদিন রমেশচন্দ্রের বিশেষ কি একটা আবশ্যকীয় কাজ ছিল, তাই তিনি আহার করিয়াই, এমন কি একটু বিশ্রাম পর্য্যন্ত না করিয়া এবং ছাতি না লইয়া, কিছু ব্যস্ততার সহিত আফিসে আসিলেন। কিন্তু আফিসে আসিয়া পৌছিতেই যেন তাহার শরীর কেমন করিতে লাগিল, চোখের সম্মুখে আঁধার জমিয়া ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার বুক কাঁপিতে লাগিল—রমেশচন্দ্র ক্রমশঃ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—কাছারীর ফরাসের উপর জ্ঞান শূন্যের ন্যায় শুইয়া পড়িলেন।

আফিসস্থ অন্যান্য কর্ম্মচারীরা সকলে ব্যস্ত ভাবে ছুটিয়া আসিল। যে যেরূপে পারে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিল। কেহ বাতাস দিতে প্রবৃত্ত হইল—কেহ চোখে মুখে মাথায় জল দিতে লাগিল—কেহ হাত পা বুলাইয়া দিতে লাগিল। কেহ কেহ ডাক্তার আনিতে যাইবে নাকি জিজ্ঞাসা করিয়া উৎকণ্ঠার সহিত উত্তরের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে নানা জনে নানা ভাবে কর্ম্মতৎপর হইল। তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য আজ—মনোমোহন। সে যে ছোট ম্যানেজার বাবুর জন্য আজ কি করিবে তাহা সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সে

কখনো বাতাস প্রদান করে, কখনো চোখে মুখে জল সিঞ্চন করে, কখনো অপরকে সরাইয়া দিয়া ব্যস্ততার সহিত হাত পা বুলায়—সে আজ বড় উৎকণ্ঠিত, ছোটবাবুর জন্য নিরতিশয় ব্যাকুল।

সে যাহা হউক—রমেশচন্দ্র ক্রমে একটু সুস্থ হইয়া উঠিলেন—চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। রৌদ্র লাগিয়া শরীরটা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল—এরকম অনেকের অনেক সময়ে হইয়া থাকে—ঘন ঘন বাতাসে ও জল সিঞ্চনে আবার সুস্থ হইলেন। রমেশচন্দ্র বাসায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "উঃ বড় শীত, বড় শীত" এইরূপ দুই তিন বার উচ্চারণ করিলেন।

বাসা বেশী দূর নয়;—মনোমোহন ও আর দুইজন কর্ম্মচারী রমেশচন্দ্রকে ধীরে ধীরে ধরিয়া লইয়া বাসায় চলিল।

রামভজন পূর্ব্বে খবর পাইয়াছিল না। সে সংবাদ শুনিবা মাত্র ছুটিয়া আসিল। সকলে এক রকম রমেশচন্দ্রকে কোলে করিয়া বাসায় পৌঁছাইল।

সুনীতি পাগলিনার মত ছুটিয়া আসিলেন। অপরিচিত লোক সকল আছে—কিন্তু সেজন্য তিনি কোনও রূপ সঙ্কোচ কি লজ্জা অনুভব করিলেন না। স্বামী পীড়িত, এখন কি আর কোন সঙ্কোচ বা লজ্জার সময়!

"কি হয়েছে, কি হয়েছে" বলিয়া সুনীতি স্বামীর কাছে ছুটিয়া আসিলেন, গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন—ভয়ানক তাপ—বুঝিলেন, জ্বর হইয়াছে। সুনীতি আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, ত্বরিত পদে গৃহের ছাদে ছুটিয়া যাইয়া রৌদ্রে দেওয়া বিছানার চাদর, বালিস প্রভৃতি আনিয়া শয্যা রচনা করিয়া দিলেন।

রমেশচন্দ্র শয়ন করিয়া সুনীতির ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"অতো ব্যাকুল হয়ো না, আমার এমন কিছু হয় নহি—মাত্র রৌদ্র লেগে শরীরটা কিছু অস্থির ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

রমেশচন্দ্র এইরূপ বলিলেন সত্য—কিন্তু তাঁহার দেহ ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে খুব জ্বর আসিল। সুনীতি বড় ভয় পাইল, লেপের উপর লেপ দিয়া স্বামীর অঙ্গ চাপিয়া ব্যাকুল ভাবে সেই সমভিব্যাহারী কর্ম্মচারীদিগকে বলিল—"আপনারা যাবেন না, দেখুন ইনি কি রকম করছেন"।

মনোমোহন বলিল—"না, আপনার কোনও ভয় নাই, আমি আছি, আমি ছোটবাবুর যেরূপ সেবা শুশ্রূষার দরকার, করছি।" এই বলিয়া সে রমেশচন্দ্রের পাশে বসিয়া তাঁহার বিবিধ শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল।

অপর দুইজন কর্ম্মচারী কিছুক্ষণ থাকিয়া বলিল—মনোমোহন বাবু, আপনি ত আছেন, আমরা এখন যাই, আবশ্যক হ'লে আমাদের সংবাদ দিবেন।

মনোমোহন বলিল—"হাঁ, আমি রহিলাম। আপনারা যান।" তাহারা চলিয়া গেল।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিপদে যাহার সেবা পাই।
তার তুল্য নিজ জন নাই॥

আজ ছয় দিন রমেশচন্দ্রের জ্বর; অদ্যাবধিও ত্যাগ হয় নাই। স্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক চিকিৎসা করিতেছেন—তিনি বলিয়াছেন—কোনও ভাবনার কারণ নাই—জ্বর শীঘ্র ত্যাগ হইবে।

এই কয়দিন সুনীতির ত কথাই নাই, মনোমোহন ও রামভজন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে রমেশচন্দ্রের শুশ্রূষা করিয়াছে ও করিতেছে। মনোমোহন ও রামভজন ত' পূর্ব্ব হইতেই এই পরিবারের নিকট-আত্মীয় স্বরূপ হইয়াছে, এই কয়দিনে মনোমোহনও নিতান্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। সে সুনীতিকে বৌদিদি বলিয়া ডাকা আরম্ভ করিয়াছে এবং সুনীতিও তাহাকে আপন দেবরের ন্যায় স্নেহের চোক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সুনীতি তাহার সঙ্গে মুক্তমুখে কথা বলেন এবং স্বামীর পীড়া সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ করিতে হইলে কি ডাক্তারকে কোন কথা জানাইতে হইলে, মনোমোহনের সঙ্গেই করেন এবং মনোমোহনের দ্বারাই জানান।

রমেশচন্দ্রও মনোমোহনের ঐকান্তিক শুশ্রূষায় ও যত্ন-সেবায় তাহার প্রতি নিতান্ত আকৃষ্ট হইয়াছেন; তাঁহাকে একেবারে কনিষ্ঠ সহোদরের তুল্য জ্ঞান করিতেছেন এবং মনোমোহন কি

পরোপকারী, কি উচ্চ হৃদয় যুবক, এরূপ ভাবিয়া তাহার চরিত্রও গুণে মুগ্ধ হইয়াছেন।

মনোমোহন যে উদ্দেশ্যে এই পরিবারের জন্ত এত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যে অভিসন্ধিতে এই পরিবারের মধ্যে একটী পরোপকারী বন্ধুর ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়াছে, সে উদ্দেশ্য, না জানি কেন, ক্রমে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছিল—কেন যেন দিন দিন মনোমোহনের মন হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। মনোমোহনের যেন সুনীতিকে প্রলুব্ধা করার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাঁহার কাছে কোনও প্রস্তাব করা দূরে থাকুক, সে কথা ভাবিতেও তাহার প্রাণ সরে না, তাহার অন্তঃকরণ মুশরিয়া পড়ে। মনোমোহন মুগ্ধনেত্রে এ কয়দিন সুনীতির চোখে মুখে সর্ব্ব অঙ্গে যে নির্ম্মল সতেজ সতীত্বের আভা দেখিতেছে, বিমোহিত প্রাণে তাঁহার চরিত্রে যে দেবী চরিত্রের গৌরব ও মহিমা উপলব্ধি করিতেছে, তাহাতে তাহার প্রাণে একটা ভক্তি ভয় মিশ্রিত অননুভূতপূর্ব্ব অলৌকিক ভাবের উদয় হইয়াছে;—সেই ভাব-তরঙ্গে তাহার হৃদয়ের সমুদয় মন্দ অভিসন্ধি ও কুবাসনার শিখা নির্ব্বাপিত-প্রায় হইয়া গিয়াছে।

জমিদারিনী কিন্তু এদিকে মনে মনে খুব নৃত্য করিতেছেন। তিনি তাঁহার দাসী দ্বারা সব খবরই রাখিতেছেন এবং সুনীতির সঙ্গে মনোমোহনের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মিয়াছে, তাহা জানিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার বামা দাসী সুনীতি ও মনোমোহনের পরিচয়টাকে তাহার চরিত্র ও ভাব অনুযায়ী রঙে রঞ্জিত করিয়া প্রতীয়মান করিতে ত্রুটি করে নাই, এবং জমিদারিনীও তাঁহার অভিপ্রেতরূপ কথা শুনিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন

করিয়া, তাঁহার মনস্কামনা শীঘ্রই সিদ্ধ হইবে মনে মনে ভাবিয়া মনে আনন্দ করিতেছেন। প্রত্যহ নানা অজুহাতে বামা দাসী রমেশচন্দ্রের বাসায় আসা যাওয়া করিতেছে এবং সুনীতি ও মনোমোহনের কথা নানারূপ রঙ ফলাইয়া কর্ত্রীর কাণে দিতেছে। কথনো হয়তো রমেশচন্দ্রের তন্দ্রা আসিয়াছে; তাঁহার তন্দ্রাভঙ্গ হইবার ভয়ে সুনীতি মনোমোহনকে অন্য কক্ষে লইয়া তাহার সঙ্গে স্বামীর অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার কি বলিয়া গেল, কি নূতন ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিল, প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ করিতেছেন, এমন সময় বামা তথায় উপস্থিত হইল এবং তাহাদের ঐরূপ গোপন আলাপন লক্ষ্য করিয়া একটু মুচকি হাসিয়া সেই কথা স্মৃতির কোটরে ভরিয়া রাখিল। আবার হয়তো কথনো রমেশচন্দ্র কিছু সুস্থ বোধ করিয়া বেশ নিদ্রা যাইতেছে—যেরূপ নিদ্রা হয়তো দুই তিন দিনের মধ্যে হয় নাই—এবং সুনীতি ও মনোমোহন ডাক্তারের আশ্বাস অনুসারে রমেশচন্দ্রের ঐরূপ নিদ্রাকর্ষণ পীড়া উপশমের লক্ষণ বুঝিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছেন ও মনের উল্লাসে একটু হাসিতেছেন, বামাদাসী ঘটনাক্রমে তখন সেখানে আসিয়া তাহা লক্ষ্য করিল এবং সেই হাসিটির একটা নিজরুচি অনুযায়ী অর্থ দিয়া মনের মধ্যে তাহার স্মৃতিটি ভরিয়া রাখিল। এইরূপে বামা নানা অছিলায়, নানাসময় রমেশচন্দ্রের বাসায় আসিয়া, সুনীতি ও মনোমোহনের মধ্যে যখন যেকথা হয়, যখন যে ভাব প্রকাশ হয়, তাহা অন্যভাবে বুঝিয়া এবং তাহাতে অন্য অর্থ সংযোজন করিয়া মনের মধ্যে ভরিয়া রাখে ও যথাসময়ে কর্ত্রীর গোচরে সেই স্মৃতি পুটুলি উন্মুক্ত করে।

এইরূপে দিন যাইতে লাগিল,—রমেশচন্দ্র সুচিকিৎসার ফলে এবং উত্তম শুশ্রূষাকারীদিগের প্রাণপণ সেবা শুশ্রূষায় ক্রমে আরোগ্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রায় মাসাধিক কালে রমেশচন্দ্র সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিলেন—সুনীতির আনন্দের সীমা রহিল না।

রমেশচন্দ্র ও সুনীতি মনোমোহনের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন—তাহার ঋণ তাঁহারা পরিশোধ করিতে পারিবেন না, এইরূপ অনুভব করিতেছেন। তাঁহারা আর মনোমোহনকে পর ভাবিতে পারিতেছেন না এবং সময়ে অসময়ে তাহাকে ডাকাইয়া তাহাকে খাওয়াইয়া এবং অন্য উপায়ে স্নেহ অর্পণ করিয়া আপনাদের কৃতজ্ঞতা ভাব প্রকাশ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। মনোমোহনও এই পরিবারের নিতান্ত নিকট-আত্মীয়ের মত রাত্রিদিনে যখন ইচ্ছা এই বাড়ীতে আসিয়া 'দাদা' ও 'বৌদিদি'র সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া এবং তাঁহাদের সাধ্যমত পরিচর্য্যা করিয়া আনন্দলাভ করিতেছে।

স্থূল কথা—রমেশচন্দ্র কি সুনীতির সহিত মনোমোহনের আর পর পর ভাব বিন্দুমাত্র রহিল না। সকলের সমক্ষে, জগতের চোখে মনোমোহন তাঁহাদের নিতান্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের স্থান অধিকার করিল।

———

ষড়্‌বিংশতি পরিচ্ছেদ।

বিপদে সম্পদে তুল্য পত্নী অর্দ্ধাঙ্গিনী,
আবাসে প্রবাসে বনে মঙ্গলসঙ্গিনী।

ক্রমে এক দুই তিন করিয়া ছয় মাস গত হইল। সুনীতি আসন্ন প্রসবা হইয়া উঠিলেন। এমন সময় জমিদারিণী স্বয়ং আদেশ দিলেন যে ছোট ম্যানেজার শীঘ্র মফঃস্বল যাইয়া মহালের অবস্থা তদারক করিয়া আসুন। রমেশচন্দ্র বড় বিপদে পড়িলেন। সুনীতি এই নয়মাস গর্ভবতী—এই অবস্থায় তাহাকে একাকী বাসায় রাখিয়া কি করিয়া মফঃস্বলে যাইবেন। রমেশ-চন্দ্র অন্য উপায় নাই দেখিয়া বড় ম্যানেজারের নিকট গেলেন এবং সমস্ত কথা জানাইলেন। বড় ম্যানেজার সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—অচ্ছা, রমেশবাবু আমি যতদূর পারি করব, কর্ত্রী শুনিবেন কি না, কে জানে? আপনিও বরং স্বয়ং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া এ বিষয় জ্ঞাপন করুন।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—'না, বড় বাবু আমি তাহার সহিত সেই ঘটনার পর আর দেখা করিনাই, তিনি আমার উপর রেগে আছেন, আমি এখন দেখা করলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা, আমার অনুরোধ, আপনি আমার হয়ে দুট কথা কর্ত্রীকে বলুন,—আমার বিশ্বাস, অপেনার কথা তিনি তুচ্ছ করতে পারবেন না।

বড় ম্যানেজার বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখবো; ফলে কি হয় আপনাকে জানাব।

* * * *

পরদিন যথাসময়ে রমেশচন্দ্র বড় ম্যানেজার বাবুর সঙ্গে দেখা করিলেন। বড় ম্যানেজার বাবু বলিলেন—"না, রমেশ-বাবু, তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হলেন না। আমি সমস্ত কথাই ভেঙে বললাম এবং খুব বুঝায়ে জানালেম—যে এই সকল কারণে আপনার এক্ষণে মফঃস্বল যাওয়া নিতান্ত কঠিন ও অসুবিধা; এও বললাম—না হয়, কয়দিন পরে মফঃস্বল যাবার আদেশ দিন। শেষে যখন তিনি কিছুতেই আমার কথা রাখতে চাইলেন না, তখন এ পর্য্যন্তও বললাম যে, না হয় ছোট ম্যানেজার কয় মাস সদরের ভার নিন্, আমি, মফঃস্বল যাই। তাহাতেও তিনি সম্মত হলেন না। রমেশবাবু, আমি আর কি করবো? রমেশবাবু, বলতে কি কর্ত্রীর কথায় আমার স্পষ্ট মনে হলো—যে তিনি ইচ্ছা করেই সব জেনে শুনে আপনাকে অসুবিধায় ফেলবার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমানে এই আদেশ দিয়েছেন।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—সে বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে? তবে এখন কি করি, বড় বাবু? তবে কি স্ত্রীকেও সঙ্গে করে করে নিয়ে যাব?

"দেখুন, সেটা বিবেচনা ক'রে। যদি তা পারেন, সেটা মন্দ হয় না। এস্থানে যদিও আমরা দেখতে শুনতে পারবো, তথাপি খালি বাসায় যুবতী স্ত্রীকে ঐ অবস্থায় রেখে যাওয়া

সঙ্গত মনে করি না। বিশেষ মনোমোহন যখন বাসায় আসা যাওয়া করে—লোকটা তত চরিত্রবান্ নয়।

রমেশচন্দ্র বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন—সে কি! মনোমোহনের চরিত্র ভাল নয়? তা হলেও, আমাদের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও সম্মান জ্ঞান। আমরা তাহার নিকট অতি কৃতজ্ঞ।

বড় ম্যানেজার বলিলেন—সে হ'তে পারে, তবে সব সময় মানুষের বাহ্যিক দেখে মানুষ চেনা যায় না। যাক্, তথাপিও আপনার স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় বাসায় একাকিনী রেখে যাওয়া সম্বন্ধে আমি পরামর্শ দিই না; বিশেষ যখন কর্ত্রী স্বয়ং তাঁহার দ্বেষচারিণী।

এই কথায় রমেশচন্দ্রের সম্পূর্ণ হুঁস হইল, তিনি সম্যক্‌রূপে বুঝিলেন যে সুনীতিকে কোনওরূপেই এখানে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া উচিত নয়—স্বদেশে বিদেশে যেখানেই যাইতে হয়, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়াই উচিত।

রমেশচন্দ্র সুনীতিকে সঙ্গে লইয়া মফঃস্বল যাইতে সঙ্কল্প করিয়া বড় বাবু হইতে বিদায় লইলেন।

সপ্তবিংশতি পরিচ্ছেদ।

কামান্ধা রমণী জঘন্য এ এমনি
সাধিতে উদ্দেশ্য নিজ
লজ্জা অপমান ভাবে, করিবারে
নাহি কর্ম্ম হেন নীচ!

গভীর রাত্রি—প্রায় দু-প্রহর রাত্রি হইবে—চতুর্দ্দিক নীরব, মানুষের সাড়া শব্দ নাই। কর্ত্রী ব্রহ্মময়ী একাকিনী আপন শয়ন কক্ষে বসিয়া আছেন। ক্ষণে ক্ষণে উৎকর্ণ হইয়া কোনও শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিতেছেন; আবার যেন সেই প্রত্যাশিত শব্দের অভাবে ভাবনায় নিমগ্ন হইতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন—আমার প্রাণে শান্তি নাই কেন? আমার বুকের মধ্যে সর্ব্বদা এই আগুণ জ্বলিতেছে কেন? রমেশচন্দ্র আমার কে? তাহাকে আমি ভুলিতে পারিতেছি না কেন? আমার অভাব কি, আমার দুঃখ কিসে?—তবে কেন অযথা তাহার জন্য ভাবি? সে আমার ভৃত্য, আমার আদেশের দাস, আমার অন্নে পালিত—আমার তুলনায় অতি তুচ্ছ, অতি সামান্য ও দরিদ্র। তাহাকে কীটের তুল্য গণ্য করিতে পারি।—তবে তা করি না কেন? আমার প্রণয়ে সে ধন্য হইয়া যাইত—তাহার ভাগ্য ফিরিত। যখন সে তাহা গ্রহণ করিল না—অহঙ্কার বশে উপেক্ষা করিল, তাহাতে সেই তাহার নিজের পায়ে কুড়াল মারিল, আপনার ভাগ্যতরু বিনষ্ট করিল। তাহাতে আমার কি হইয়াছে, আমি তজ্জন্য

প্রতিহিংসায় জ্বলিতেছি কেন? কেন অযথা এই অশান্তি জ্বালা আমি আমার নিজের সৃষ্টি করিয়াছি।

কর্ত্রী আবার নীরব হইয়া কতক্ষণ উৎকণ্ঠিত ভাবে কিসের শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিলেন—কোনও শব্দের সাড়া পাওয়া গেল না—তিনি আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন;—"হাঁ আমার" অশান্তি আমিই সৃষ্টি করিয়াছি; তবুও এই অশান্তির শান্তি চাই, এই জ্বালার শেষ চাই। কোথায় সেই শান্তি পাইব—কিসে এ জ্বালার শেষ হইবে? আর অন্য উপায় নাই—এক মাত্র উপায়—এই রমেশ ও তাহার স্ত্রীর মদগর্ব্বিত মস্তক নত করা, চূর্ণ করা—

হঠাৎ দরজায় টুক্ টুক্ শব্দ হইল। কর্ত্রী ধীরে ধীরে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। বামা দাসী ও তৎ পশ্চাৎ মনোমোহন বাবু কক্ষে প্রবেশ করিল।

"আসুন মনোমোহন বাবু, অনেক দিন পরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, এর মধ্যে ত আর আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে সময় পান নি"

কর্ত্রীর এই সম্ভাষণে মনোমোহন কর্ত্রীর প্রতি উজ্জ্বল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—"আমি না আসতে পেরে যদি কোন অপরাধ করে থাকি ও আপনার মনে দুঃখ দিয়ে থাকি, ক্ষমা প্রার্থনা করি—আমরা নগণ্য লোক, যখন তখন কর্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করতে সাহস পাই না, ডাকাইলেই আসতে সাহস হয়।

"কেন, কেন—ভয় কি? তোমাকে ত' আর পর মনে করিনা। তুমি যখন ইচ্ছা, আসতে পার, তবে লোকের চক্ষু এড়ায়ে।"

কর্ত্রীর কথার ভাবে ও 'তুমি' সম্বোধনে মনোমোহনের প্রাণ

নাচিয়া উঠিল—কি এক আশার ঝঙ্কারে তাহার হৃদয় তন্ত্রী ধ্বনিত হইয়া উঠিল—সে ভাবাবিষ্টের ন্যায় গদ গদ কণ্ঠে বলিল—

তবে তবে কি আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন? তবে কি আমি আপনার অনুগ্রহের—প্রসাদের—

কর্ত্রী বাধা দিয়া বলিলেন—"হাঁ, তুমি উপযুক্ত হবে, যদি আমার মনস্কামনা পূর্ণ করতে পার।" যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছ, তার কতদূর। বামার মুখে ত' শুনি—তুমি নাকি বেশ একটু অগ্রসর হ'তে পেরেছ। বামা তাড়াতাড়ি বলিল—"ওমা, শুধু অগ্রসর কি!—মনোমোহন বাবু যে পাকা ছেলে—সে কি এখনও কিছু বাকী—

মনোমোহন বামাকে বাধা দিয়া বলিল—"না না, ও কথা বলো না বামা! রমেশ বাবুর স্ত্রী নিতান্ত সৎ রমণী—তাঁহার মধ্যে মন্দের কিছুমাত্র নাই; এক নির্ম্মম দানব ব্যতীত আর কেহ তাঁহার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হ'তে পারে না।

কর্ত্রী বিস্মিত হইলেন, কিছুক্ষণ মনোমোহনের প্রতি চক্ষু স্থির রাখিয়া বলিলেন—"ও তবে তুমি উহার চরিত্রে মুগ্ধ হয়েছ? তোমার দ্বারা তবে আমার কার্য্য নিষ্পন্ন হবেনা, বুঝলাম।"

"দানব না হ'তে পারলে' আমার দ্বারা সে কার্য্য সাধিত হবে না। রমেশ বাবুর স্ত্রী দেবী তুল্যা রমণী—তাঁহাকে আমি পূজা করতে পারি; তাঁর সমক্ষে দাঁড়ায়ে কলুষ ভাব পোষণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

মনোমোহন একটু উত্তেজিত কণ্ঠে এ কয়টা কথা বলিল।

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল—কোন কথা হইল না। হঠাৎ কর্ত্রী বামাকে বাহিরে যাইতে বলিয়া বলিলেন—'আচ্ছা, আমি

যদি আমাকে তোমার নিকট সমর্পণ করি, তবে তুমি তোমার ঐ মানবত্ব ত্যাগ ক'রে দানব সাজতে রাজী আছ?

মনোমোহন একটু চমকিত হইয়া উৎফুল্ল নয়নে কর্ত্রীর মুখপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আবার নত করিল।

কর্ত্রী ধীরে ধীরে তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া তাহার স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া কোমল রসাদ্র কণ্ঠে বলিলেন—'আমি জানি, তুমি আমার অনুগ্রহ প্রার্থী—আমিও তোমায় ভালবাসি—তুমি যদি আমার এই কাজটুকু সাধন কর, আমার প্রাণের অশান্তি অনল নির্ব্বাপিত কর,—আমি তোমার হব, আমরা উভয়ে আনন্দে আমোদে বিভোর হয়ে জীবন যাপন করবো।

মনোমোহন একেবারে আবিষ্ট হইয়া পড়িল—তাহার যেন একটা স্বপ্ন বোধ হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর যখন তাহার চমক ভাঙ্গিল—সে আত্মহারা ভাবে বিহ্বল স্বরে বলিয়া উঠিল—"সত্য তুমি আমার হবে? হাঁ যদি আমি তোমায় পাই, তবে আমি দানব কেন, রাক্ষস পর্য্যন্ত হ'তে পারি। তুমি আমায় প্রসন্ন হও, আমি যেরূপে পারি রমেশ বাবুর মুখে কালি দেব, তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব গৌরব ধ্বংস করবো।

"হাঁ, আমি তোমার হব,—তুমি তাহাদের গর্ব্বস্ফীত বুক চূর্ণ করে আমায় শান্তি দাও—আমার চিত্ত-জ্বালা দূর কর"—কর্ত্রী অধর কোণে ঈষৎ হাসি লইয়া তাহার অধর প্রান্তে মনোমোহনের ললাট স্পর্শ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনোমোহনের শরীরে তড়িৎ প্রবাহ ছুটিয়া গেল সে উন্মত্ত বৎ হইল—তাহার চরিত্রে, তাহার হৃদয় মধ্যে যে টুকু মানবত্ব ছিল তাহা সবলে উন্মূলিত করিয়া—

সে পূর্ণ দানব সাজিল এবং মায়াবিনীর মায়া মদিরায় অন্ধ হইয়া পশুরও অসাধ্য কর্ম্ম সাধনে সঙ্কল্প করিল।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

কুচক্রীর চক্র যদি যায় বিফলিয়া,
আরও চক্র করে সৃষ্টি, অন্তরে জ্বলিয়া।

রমেশচন্দ্র সস্ত্রীক মফঃস্বল চলিয়া গেলেন। মনোমোহন তাহাতে অনেক আপত্তি করিয়াছিল—বলিয়াছিল এই রকম পূর্ণ গর্ভবতী অবস্থায় বৌদিদিকে মফঃস্বল গ্রামের মধ্যে না লইয়া যাওয়াই ভাল—এই স্থানে তিনি থাকুন, আমরা তত্ত্বাবধান করিব, চিন্তা কি? কিন্তু তবু রমেশচন্দ্র সাহস পাইলেন না—সুনীতিকে সঙ্গে লইয়াই মফঃস্বল গেলেন।

মনোমোহন ভাবিল বোধ হয় রমেশচন্দ্র তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন—বোধ হয় তাহার উপর রমেশচন্দ্রের সন্দেহ জন্মিয়াছিল। মনোমোহনের আক্রোশ বাড়িল, জেদ চড়িল মনে মনে বলিল—"আমাকে সন্দেহ করিলে, আমি প্রাণ ঢালিয়া তোমাদের সেবা করিলাম, আত্মা মন সমর্পণ করিয়া তোমাদের ভালবাসিলাম—আর তোমরা আমাকে বিশ্বাস করিলে না। আচ্ছা, দেখি, তোমাদের কে রক্ষা করে! কর্ত্রীকে হাতে পেয়েছি—আর কি আমার কোনও ভাবনা আছে।

মনোমোহন মনে মনে এইরূপ স্থির করিল বটে কিন্তু সম্প্রতি হাতের সম্মুখে কোন সুযোগ পাইল না। রমেশচন্দ্র সুনীতিকে লইয়া স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছেন এবং সেখানে সহস্র অসুবিধার মধ্যে নিতান্ত সহিষ্ণুতার সহিত কাল যাপন করিতেছেন। মফঃস্বলের কাজ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া প্রজাদিগের অবস্থা

পরিদর্শন করা এবং বিদ্রোহী মহালের খাজনাদি আদায়ের ব্যবস্থা করা। অবশ্য মফঃস্বলস্থ কোনও এক কাছারীতে অবস্থান পূর্ব্বক এই সব কার্য্য লোকের সাহায্য করিতে হয় এবং কখনও কখনও সব ম্যানেজার বাবুর নিজেরও গ্রাম হইতে গ্রামে যাইতে হয়। রমেশচন্দ্র সুনীতিকে লইয়া একটি বড় কাছারীতে উঠিলেন —তথাকার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ বাসা বাড়ীর সুবন্দোবস্ত করিয়া দিল—বিশেষ কোন অসুবিধা রহিল না।

কিন্তু রমেশচন্দ্র যে মহালে প্রথমে আসিয়া উঠিয়াছিলেন এবং যেখানে দুই তিন মাস থাকিবেন ভাবিয়াছিলেন, সেখানে অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না। দিন পনর থাকার পরই সদর হইতে আদেশ আসিল যে পদ্মার পাড়ে এক চড়ে প্রজারা পার্শ্ববর্ত্তী অপর এক জমিদারের প্ররোচনায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে— তথায় অতি সত্বর যাইতে হইবে।

এই আদেশ আকাশ হইতে বজ্রের ন্যায় রমেশচন্দ্রকে আঘাত করিল। সুনীতির এই পূর্ণ নয় মাস—এই অবস্থায় উঁহাকে লইয়া কেমন করিয়া অসভ্য বিদ্রোহী চরের প্রজাদিগের মধ্যে যাইবে? যে কাছারীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাও একটি ছোট গ্রামে—তথায় নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও অনেকটা নির্ভাবনায় ছিলেন, কারণ প্রজারা বাধ্য ও কাছারীর কর্ম্মচারিগণও নম্র এবং শ্রমশীল। কিন্তু দূরে পদ্মাপাড়ে চড়ে কোনও স্থায়ী কাছারী গৃহ নাই, সেই মহালের এখনও সুবন্দোবস্ত হয় নাই—সেখানকার প্রজাগণ এখনও সম্পূর্ণরূপে বশ্যতা স্বীকার করে নাই—দাঙ্গা-হাঙ্গামা মামলা মোকদ্দমা লাগিয়াই আছে;—প্রজারা সব অসভ্য ইতর শ্রেণীর মুসলমান—তাহারা নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক, তাহারা

আক্রোশের মাথায় না করিতে পারে, এমন কর্ম্ম নাই। এইরূপ স্থানে, এই প্রকার লোকদিগের মধ্যে কি করিয়া সস্ত্রীক যাইবেন? অথচ এই কাছারী বাড়ীতেই বা কি করিয়া নিঃসহায় অস্থায় কয়েকটি অপরিচিত ও অনাত্মীয় লোকের ভরসায় স্ত্রীকে রাখিয়া যান?

রমেশচন্দ্র বড়ই বিপদে পড়িলেন। তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া, সমস্ত বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিয়া এই স্থানে আরও অন্ততঃ দুই মাস কাল থাকিবার অনুমতি চাহিয়া সদরে পত্র লিখিলেন। বড় ম্যানেজার নিরতিশয় সহানুভূতিসূচক পত্রের উত্তর দিলেন, কিন্তু শেষাংশে লিখিলেন যে কর্ত্রী অটল—যদিও তিনি রমেশ-চন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া বিশেষরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কর্ত্রীর আদেশ পরিবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। বড় ম্যানেজারের এই পত্র আসিতে না আসিতে কর্ত্রীর দ্বিতীয় এক আদেশ পত্র আসিয়া উপস্থিত হইল যে রমেশচন্দ্র যেন সাত দিনের মধ্যে ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পদ্মার চড-মহালে যান, নতুবা নিতান্ত অন্যায় হইবে এবং এই আদেশ লঙ্ঘনের দোষে রমেশচন্দ্র দোষী হইবেন।

রমেশচন্দ্র আর কি করিবেন—মনে মনে পরের দাসত্ব করা কি ঝকমারি—ইহার চেয়ে অর্দ্ধাশনে স্বাধীন ব্যবসায় অনেক ভাল ছিল,,প্রভৃতি আলোচনা করিয়া সুনীতিকে সেই কাছারীতেই তথাকার কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া মহালে যাইতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

দুই তিন দিনের মধ্যেই যাইবেন এইরূপ সমস্ত বন্দোবস্ত হইয়াছে—এমন সময় সুনীতির শরীর অসুস্থ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসববেদনার ন্যায় বেদনা উদরে অনুভূত হইল। হঠাৎ

এইরূপ বেদনা উপস্থিত হইবার কারণ কি?—তবে কি প্রসবকাল উপস্থিত? এই পূর্ণ নয় মাস—এ সময়েও সন্তান প্রসব হওয়া অসম্ভব কি অস্বাভাবিক নহে। তাই রমেশচন্দ্র দুই দিন অধিক থাকিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন।

এদিকে সুনীতির বেদনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে অথচ কোন প্রসব হইতেছে না। বড়ই চিন্তার কথা হইয়া দাঁড়াইল। গ্রামে ডাক্তার কবিরাজ ভাল নাই—এখন উপায় কি?

গ্রামের বৃদ্ধ বৃদ্ধারা যাহা কিছু মুষ্টিযোগ মত জানে, তাহাই অগত্যা প্রয়োগ করা হইল। তিন চার দিন এই ভাবে গেল—অবশেষে পঞ্চম দিনে সুনীতি অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হৃতচেতনা হইয়া মরণাপন্ন স্বরূপ হইলেন। রমেশচন্দ্র চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। তিনি সমস্ত ভুলিয়া দেহ মন নিয়োগ করিয়া পতিপরায়ণা প্রাণ প্রিয়তমা স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অতি কষ্টে একটি বর্ষিয়সী রমণী সংগ্রহ করিয়া তাহার যত্ন ও তত্ত্বাবধানে শিশুকে রাখিয়া রমেশচন্দ্র স্বয়ং পত্নীকে শমনের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য জীবন পণ করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে একজন অর্দ্ধশিক্ষিত গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন—তাহার সহায়তা গ্রহণ করিতে হইল। ডাক্তারটি সেইরূপ উচ্চ শিক্ষিত না হইলেও, অভিজ্ঞ ও হৃদয়বান্ ছিলেন। তিনি যথাসম্ভব ও যথাশক্তি চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্রের আহার নিদ্রা নাই, চাকুরী থাকিবে, কি, না থাকিবে, সে চিন্তা নাই,—তিনি মন প্রাণ ঢালিয়া স্ত্রীর শুশ্রূষা করিতেছেন এবং কি উপায়ে সুনীতি পুনরায় সুস্থ হইয়া উঠেন তাহাই কেবল তাঁহার চিন্তা ও ভাবনা এবং ভগবানের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা।

এক দুই করিয়া দশ বার দিন চলিয়া গেল—সুনীতির অবস্থার কিছু উন্নতি দেখা গেল না; তবে অবনতিও বিশেষ কিছু নাই। সকলে আশা করিতে লাগিল—আর দুই চার দিনের মধ্যেই সুনীতি সারিতে আরম্ভ করিবেন। রমেশচন্দ্র সুনীতিকে এই অবস্থায় অচেনা দেশের অচেনা লোকদিগের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি এক মাস পরে পদ্মার চড় মহালে যাইবার আদেশ চাহিয়া আবেদন করিলেন। চারি দিন পর উত্তর আসিল—উত্তর পাইয়া রমেশচন্দ্র ও ঐ কাছারীস্থ সমস্ত লোক একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

রমেশচন্দ্রকে আদেশ অমান্যের জন্য সব ম্যানেজারী পদ হইতে বিচ্যুত করিয়া পদ্মার চড় মহালের প্রথম নায়েব করা হইয়াছে এবং বেতন ৭৫৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকা করা হইয়াছে।

রমেশচন্দ্র একেবারে মর্ম্মাহত হইলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দম্পতির প্রাণ যদি শুদ্ধ প্রেমে বাঁধা,
পরস্পরে করে সেবা, না মানিয়া বাধা।

রমেশচন্দ্র এই আদেশে মর্ম্মে মর্ম্মে জ্বলিতে লাগিলেন এবং তখনই চাকুরী ইস্তফা দিয়া যাইবেন এইরূপ মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু, এদিকে সুনীতির শারীরিক অবস্থা ঐরূপ, তারপর আর্থিক অবস্থাও নিতান্ত স্বচ্ছল নহে। কাজেই সম্প্রতি এ অবমাননা কোনও রকমে সহ্য করিয়া সুনীতির সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত, আর কয়েকটা মাস থাকিতে মনস্থ করিলেন।

এক মাসকাল পার হইয়া যাইবার পর হইতে সুনীতি ক্রমে সুস্থ হইতে লাগিলেন—ক্রমে শরীরে রক্ত ফিরিয়া আসিতে লাগিল এবং হাড়ে মাংসও জন্মিতে লাগিল। রমেশচন্দ্রের যত্নের ও শুশ্রূষার ত্রুটি নাই। যখন সুনীতি একটু সবল হইয়া উঠিলেন,—তখন তিনি স্বামীর কার্য্যকলাপে বড়ই লজ্জা পাইলেন।

সুনীতি যখন চলৎ-শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন মলমূত্র ত্যাগ ঘরের মধ্যেই করিতেন, এবং তাহা রমেশচন্দ্র স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন; তদ্ব্যতীত স্ত্রীকে ঔষধাদি দেওয়া, পথ্যাদি খাওয়ানো সমস্তই যথা সময়ে যথানিয়মে তিনি স্বয়ং করিতেন।

সুনীতি উগ্রব্যারামের সময় রমেশচন্দ্রকে এই সব করিতে যে না দেখিয়াছেন, এরূপ নহে—তবে তখন শরীরে এত গ্লানি যন্ত্রণা ও দুর্ব্বলতা যে কিছু বলিতে পারেন নাই। কিন্তু একটু

সুস্থ ও সবল হইতেই তিনি আর স্বামীকে তাঁহার নিজের জন্য এত করিতে দিতে নিরাতিশয় লজ্জা ও ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন।

সুনীতি তখনও বাহিরে যাইতে সমর্থ হন নাই। এক দিন যেমন রমেশচন্দ্র সুনীতির মলমূত্রের পাত্র পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া দিবার জন্য ধরিলেন, সুনীতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—শরীরে যাহা কিছু দুর্ব্বলতা ছিল, ঝাড়িয়া ফেলিয়া, ত্রস্তে শয্যা হইতে উঠিয়া যাইয়া স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিলেন—"ছি, ছি, আর কেন, আমার জন্য তুমি অনেক করেছ,—আর করতে দেব না—রাখ, এ সব আমিই ফেলবো।"

রমেশচন্দ্র উদ্বিগ্নভাবে সুনীতিকে ধরিয়া বলিলেন—"না, না, তুমি এখনও সুস্থ হও নাই, এখনও শয্যা ত্যাগ করে বাইরে যাবার সম্পূর্ণ শক্তি পাও নাই—যাও যাও, ছেড়ে দেও—আমি এগুল ফেলে স্নান করে আসি।

সুনীতি কাতর স্বরে অথচ স্থির কণ্ঠে বলিলেন—"না, না—এ আর হ'তে পারে না, আমার দেহে কিছু মাত্র শক্তি থাকতে, আমি চোখে দেখে, এ সব তোমায় করতে দেব না—তা হ'লে, আমি তোমার উপযুক্ত স্ত্রী হতে পারবো না; তোমার মত দেবতা স্বামী যে পেয়েছি, তার গৌরব করতে লজ্জা পাব।"

পতি পত্নীতে অনেকক্ষণ ঐ মলমূত্রের ভাণ্ড নিয়া টানাটানি হইল—সুনীতি কিছুতেই রমেশচন্দ্রকে উহা আর পরিষ্কার করিতে দিলেন না। কাজেই রমেশচন্দ্র হার মানিলেন এবং স্ত্রীকে উহা পরিষ্কার করিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। সুনীতি ধীরে ধীরে, কিছু কষ্ট সহকারে ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়া মলমূত্র ফেলিয়া

দিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিলেণ এবং তুলসীপাতার জল মাথায় দিয়া, শয্যায় আসিলেন।

যে স্বামী স্ত্রী এরূপ আদর্শ-দম্পতি এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাঁহাদের ক্রিয়াকর্ম্মাপই এইরূপ হইয়া থাকে। এক অন্যের জন্য সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিতে কিছু মাত্র ইতস্ততঃ করে না, আবার একজন অপরকে নিজের জন্য বিন্দুমাত্র ক্লেশ দিতে বুকভাঙ্গা ব্যথা অনুভব করে।

তারপর ক্রমে ক্রমে আট দশ দিনের মধ্যে সুনীতি বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন, উঠিতে বসিতে হাঁটিতে সক্ষম হইলেন ; ছেলেকেও কোলে লইয়া স্তন্যপান করাইতে পারিতে লাগিলেন। তখন রমেশচন্দ্র ভাবিলেন—এক্ষণে পদ্মার চড়ে যাই, সেখানে কাজ করিতে করিতে অন্যত্র কাজের চেষ্টা করিব এবং ভগবানের কৃপায় অন্য স্থানে চাকুরী মিলিলেই, এই নির্ম্মমা জমিদারিণীর চাকুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।'

সুনীতিও সেই পরামর্শ সঙ্গত মনে করিয়া অনুমোদন করিলেন।

অতএব আর দুই তিন দিন তথায় থাকিয়া রমেশচন্দ্র সস্ত্রীক পদ্মার চড় মহালে যাত্রা করিলেন। যে বর্ষীয়সী রমণীটি - ছেলেটিকে এতদিন লালন পালন করিয়াছেন, তাহাকেও সঙ্গে লইবার জন্য সুনীতিও রমেশচন্দ্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারেন নাই—সে কিছুতেই স্বগ্রাম ছাড়িয়া যাইতে স্বীকার করিল না।

এতক্ষণ একটা কথা বলা হয় নাই। পাঠক পাঠিকারা জানিয়াছেন যে রামভজন রমেশচন্দ্রের নিতান্ত অনুগত লোক

হইয়াছিল। তবে সে কেন রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আসে নাই—সে রমেশচন্দ্রের এই দুর্দ্দিনে কোথায় রহিল—সে বিষয়ে সকলের মনে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে। রামভজন রমেশচন্দ্রের সঙ্গে আসিতে নিরতিশয় উৎসুক হইয়াছিল এবং রমেশচন্দ্র ও সুনীতি উভয়ই তাহাকে আনিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন,—কিন্তু জমিদারিণী তাহাকে আসিতে দেন নাই। তিনি বিবিধ সূত্রে জানিতে পারিয়াছিলেন যে রামভজন রমেশচন্দ্রের প্রতি বড় অনুরক্ত,—রামভজনের মত একটি কর্ম্মঠ ও প্রভুভক্ত লোক সঙ্গে থাকিলে কোন বিপদই, কোনও অসুবিধাই রমেশচন্দ্রকে স্পর্শ করিতে পারিবে না—উত্তপ্ত আগুণের মধ্যে রমেশচন্দ্রকে নিক্ষেপ করিলেও, রামভজন নিজে সেই আগুণ অঙ্গে ধরিয়া রমেশচন্দ্র ও সুনীতিকে রক্ষা করিবে। তাহা হইলে—কর্ত্রীর অভিসন্ধি পণ্ড হইবে—সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। কর্ত্রীর রমেশচন্দ্রকে হঠাৎ মফঃস্বলে যাইবার আদেশ দিবার উদ্দেশ্য ছিল এই যে সুনীতির এই অবস্থায় রমেশচন্দ্র কখনও তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারিবেন না, বাসায় রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন, এবং সেই সুযোগে মনোমোহন তাহার উদ্দেশ্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু যখন দেখিলেন যে রমেশচন্দ্র তদ্রূপ করিলেন না, সুনীতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন, তখন যাহাতে মফঃস্বলে রমেশচন্দ্র নিতান্ত ক্লেশ ও অসুবিধায় পতিত হয়,—তাহারই উদ্যোগী হইলেন। কাজেই রামভজনকে সঙ্গে আসিতে দিলেন না। কর্ত্রীর ধারণা যে রমেশচন্দ্র যখন সুনীতিকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িবেন, তখন বাধ্য হইয়া আবার স্ত্রীকে সহরের বাসায় রাখিয়া যাইবেন। তাই তিনি মফঃস্বলের কাছারীতে উঠিয়া

কয়েকদিন থাকিতে না থাকিতেই পদ্মার পাড় চড়ের মহালে যাইতে রমেশচন্দ্রের প্রতি দৃঢ় আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

নিপতিতা, কলুসিতা রমণী, সতী হিন্দুরমণীর মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। সতীস্ত্রী যে সহস্র কষ্ট ও সঙ্কট উপেক্ষা করিয়া হাসি মুখে স্বামীর সঙ্গে বনে কান্তারে পর্ব্বতে পর্য্যন্ত যাইতে পাবে ও যায়, তাহা বিভব-বিলাস-বিমূঢ়া জমিদারিণী বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ইহাও বুঝিতে পারেন নাই—যে পত্নীপরায়ণ চরিত্রবান্ দৃঢ় হৃদয় স্বামী পত্নীর নির্ব্বিঘ্নতার জন্য, তাহাকে লজ্জা ও অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিজের কোনও কষ্টকে কষ্ট বলিয়া জ্ঞান করে না,—নিজে সহস্র কণ্টকের বোঝা মাথায় বহিযা প্রেমময়ী পত্নীকে বক্ষে রাখিতে প্রস্তুত হয়।

তাই যখন জমিদারিণী শুনিলেন যে সুনীতির কঠিন পীড়ার সময় রমেশচন্দ্র হাসি মুখে সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন;—যখন শুনিলেন, পত্নীর প্রেমে বিভোর থাকিয়া, উচ্চপদ হইতে পদচ্যুতিরূপ অপমান অটলভাবে শির পাতিয়া লইয়া সস্ত্রীক সেই বিপদ সঙ্কুল চড়ের মহালে গিয়াছেম, তখম তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং অপরিসীম হিংসামূলক বেদনার মধ্যেও উহাদের চরিত্রমাহাত্ম্যে ও প্রেমমহিমায় একটু আশর্য্য বোধ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না:

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুণে মুগ্ধ নরনারী—সভ্য কি বর্ব্বর,
সতের অবাতি অল্প এই ধরা পর।

যখন রমেশচন্দ্র স্ত্রীসমভিব্যাহারে চড়ের মহালে গেলেন তখন প্রতিহিংসাময়ী কর্ত্রী যদিও মনে মনে সেই অপূর্ব্ব দম্পতির প্রবল ও নির্ম্মল দাম্পত্য প্রেমের স্বর্গীয় চিত্রে চমৎকৃত হইলেন, তথাপিও তাহাদের যে কিছুতেই ষড়যন্ত্রের জালে ধরিতে পারিতেছেন না ভাবিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং মনোমোহনের সহিত গাঢ় পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন।

মনোমোহন কর্ত্রীকে আশ্বাস দিল যে চড়মহালে কখনই রমেশচন্দ্র সুনীতিকে লইয়া শান্তিতে থাকিতে পারিবে না, সেখানে অশিক্ষিত অসভ্য ডাকাত প্রকৃতির চড়ের প্রজাদিগের মধ্যে নানা রকমে বিড়ম্বিত হইবে এবং অবশেষে না হয় চাকুরী ত্যাগ করিতে নতুবা স্ত্রীকে সদরে রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইবে।

কিন্তু এদিকে রমেশচন্দ্র সেই অসভ্যদিগের মধ্যে যাইয়া বিশেষ সুখের আড্ডা গড়িয়া বসিলেন। প্রজারা প্রথম প্রথম জমিদারের একজন কর্ম্মচারীকে তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকিতে দেখিয়া বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল ও নানারকম অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়া তাঁহাকে বিতাড়িত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। কিন্তু রমেশচন্দ্রের ও সুনীতির মিষ্ট বাক্যে ও কোমল ব্যবহারে তাহারা ক্রমে তাঁহাদের বশীভূত ও তাঁহাদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিল।

রমেশচন্দ্র এ স্থানে কিছুদিন থাকিথা অন্যত্র চাকুরী লইয়া যাইবেন, এইরূপ মনস্থ করিয়াই আসিয়াছিলেন, কিন্তু যখন এস্থানে আসিলেন এবং প্রজাদিগের অবস্থা চাক্ষুষ করিলেন, তখন তাঁহাব মনেব ইচ্ছা অন্যদিকে ধাবিত হইল। এই অজ্ঞান অন্ধ ও অসভ্যতাব তমোগর্ভে নিমজ্জিত মনুষ্যদিগেব উন্নতিকল্পে তাহাদের হিতকব কার্য্যে আপনাকে নিয়োগ করিয়া জীবন সার্থক কবিবাব আকাঙ্খা তাহাব বলবতী হইল। তিনি ভাবিলেন—শুধু অর্থ কিম্বা যশ উপার্জ্জন কবিয়া নিজে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকিলেই জীবনেব সার্থকতা হয না;—যে টাকা এখন তিনি পাইবেন, যদিও তাঁহার পদ খর্ব্বতা ও মাহিনা হ্রাস হইযাছে,—তাহা তাহার মত ছোট পবিবারেব অন্ন বস্ত্রেব সংস্থান পক্ষে অপ্রতুল হইবে না,—তবে অযথা অন্যস্থানে অধিক অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশ্যে উত্তম চাকুবীব চেষ্টা কবিয়া বিশেষ কি লাভ হইবে? তদ্পবিবর্ত্তে এখানে যে টাকা পাওযা যাইতেছে, তাহাতেই তুষ্ট থাকিয়া যদি ভগবানের নাম স্মবণ কবিয়া এই সকল লোকদিগকে কিছু শিক্ষিত করিয়া সভ্যতার পথে অরূঢ় কবিতে পারি, তবে একটী মানুষের উপযুক্ত কাজ কবা হইবে এবং তাহাতে নিজেব জীবনেও অনেকটা আনন্দ ও তৃপ্তি আসিবে।

সুনীতি বমেশচন্দ্রেব ছায়াতুল্য—উভয়েব হৃদয়ই উচ্চ ও উদার। বমেশচন্দ্র সুনীতিকে পার্শ্বে লইযা কল্পিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

রমেশচন্দ্র প্রজাদিগের মধ্যে যাহারা 'মণ্ডল' অর্থাৎ প্রধান স্থানীয়, তাহাদের আহ্বান করিয়া তাহাদের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়া একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। তিনি সকলের

বাড়ী বাড়ী যাইয়া, সকলের সহিত মিশিয়া, আলাপ করিয়া, যাহার যেরূপ অবস্থা তাহার নিকট হইতে সেইরূপ অর্থ সংগ্রহ করিলেন। প্রথমে রমেশচন্দ্র স্বয়ং সেই স্কুলের শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। এদিকে সুনীতি প্রজাদিগের মেয়েদের নিজবাসায় আনাইয়া তাহাদের সহিত মিষ্ট কথায় আলাপ করিয়া ও নানারূপে মধুর ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে বশ করিতে লাগিলেন। রমেশচন্দ্র ও সুনীতি মানগর্ব্ব ত্যাগ করিয়া যখন যে প্রজার বাড়ীতে ব্যারাম-পীড়া উপস্থিত হয়, সে বাড়ীতে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা ও আবশ্যক হইলে নিজেরা বসিয়া সেবা শুশ্রূষাও করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নহে, প্রজাদের বাড়ী-বাড়ী যাইয়া কাহার কিরূপ অবস্থা, কাহার কি কি অভাব, তাহা জানিয়া সে অভাব দূর করিতে বিবিধ উপায়ে চেষ্টা যত্ন করিতে লাগিলেন। যাহার ঘর নাই, তাহাকে একখানা ঘর করিয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। যাহার অন্নের সংস্থান নাই, সে যাহাতে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন আহার করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতে যে টাকার আবশ্যক হইত, রমেশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন প্রজাদের নিকট হইতে লইতেন এবং নিজেও যথা সম্ভব দিতেন।

এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই প্রজাবৃন্দ রমেশচন্দ্রের নিতান্ত অনুরক্ত ও বশীভূত হইয়া পড়িল এবং তাঁহাকে যথার্থ হিতৈষী বন্ধু ও উদ্ধারকর্ত্তা ভাবিয়া তাঁহার প্রতি যৎপরনাস্তি ভক্তি ও অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিল।

রমেশচন্দ্র মধ্যে মধ্যে সমস্ত প্রজাদিগকে ডাকাইয়া এক সভার

ন্যায় করিয়া তাহাদের সহিত বিবিধ বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেন। নানাবিষয়ে উপদেশ দিতেন, পত্রিকা পাঠ করিয়া বাহিরের সংবাদ জানাইতেন—অন্য অন্য দেশের লোকেরা কিরূপ শিক্ষিত ও উন্নত, তাহা বুঝাইয়া বলিতেন এবং কিরূপে প্রকৃত উন্নতি লাভ করা যায় ও জ্ঞান উপার্জ্জন ব্যতীত যে উন্নতি হয় না, তাহা বুঝাইয়া দিতেন। কখনো কখনো ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ও বলিতেন—সকলের ভগবান্ এক, ভগবানে ভক্তি করা, তাঁহাকে ডাকা, চিন্তা ধ্যান করা যেমন আবশ্যক, তেমন দ্বেষহিংসা ত্যাগ করিয়া সমগ্র মানবজাতিকে ভালবাসা, মানবজাতির কল্যাণে স্বার্থ বিসর্জ্জন করাও আবশ্যক, নতুবা পরিপূর্ণ ধর্ম্ম হয় না,—জীবনের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে রমেশচন্দ্র সেই অশিক্ষিত চড় অধিবাসীদিগের মধ্যে নূতন জীবন সঞ্চার করিতে লাগিলেন—তাহাদের চোখে নূতন আলোক ধরিতে লাগিলেন—তাহাদের শিরায় শিরায় নূতন ধারায় স্রোত বহাইতে লাগিলেন। তাহারাও প্রাণে প্রাণে নাচিয়া উঠিল—জীবনের গতি নূতন ভাবে গঠিত করিয়া উন্নত ও সভ্য হইবার চেষ্টায় ধাবিত হইল। প্রায় এক বৎসর অতীত হইতে চলিয়াছে—রমেশচন্দ্র এই এক বৎসরের মধ্যে এই চড়ের প্রজাদিগকে চরিত্রেও শিক্ষায় অনেক উন্নত করিয়াছেন এবং তাহাদের লইয়া তাহাদের মধ্যে বাস করিতে নিরতিশয় শান্তি ও তৃপ্তি অনুভব করিতেছেন।

ক্রমে এই কথা সদরে পৌছিল—তথাকার সকলেই বুঝিল যে স্বভাব ও চরিত্রগুণে যে পশুও বাধ্য হয় কথা আছে—তাহা

সত্য। কিন্তু যাহার অধিক আনন্দ হইবার কারণ ছিল—বিদ্রোহী মহালে শৃঙ্খলা ও সুশাসন স্থাপিত হওয়ায় আয়ের বৃদ্ধি হওয়াতে যাহার সকলের চেয়ে অধিক সন্তোষ লাভ করিবার কথা—তিনি এই সংবাদে দুঃসহ মর্ম্ম জ্বালায় জ্বলিয়া সহিতে লাগিলেন। ক্ষতি হউক, মহাল বিনষ্ট হইয়া যাক, তাহা সহ্য হয়, কিন্তু রমেশচন্দ্র ও সুনীতি যে প্রতিপত্তি ও যশ লাভ করিয়া পরম সুখে ও শান্তিতে দিন অতিবাহিত করিবে, ইহা জমিদারিণী কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন না। তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে আবার তাহাদের সুখের বাসা ভাঙিয়া নূতন বিপদের মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দেবতা সকাশে দৈত্য মুশরিয়া পড়ে
চরিত্র সুষমা সর্ব্ব অভিসন্ধি হরে।

মনোমোহনের সহিত নির্জ্জনে গভীর নিশীথে নানারূপ গূঢ় পরামর্শ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। মনোমোহন এক্ষণে কর্ত্রীর নিতান্ত প্রিয় হইয়া পড়িয়াছে—মনোমোহন ব্যতীত কর্ত্রীর আর চলে না। সমস্ত বিষয় ব্যাপারেই কর্ত্রী মনোমোহনের পরামর্শ গ্রহণ করেন। মনোমোহন এক্ষণে এই ষ্টেটের একজন লোক—বড় ম্যানেজার হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর সর্ব্বক্ষুদ্র ভৃত্যটি পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে এখন গণ্য করিয়া চলে।

মনোমোহন কর্ত্রীর আদরে ও আনুকূল্যে গর্ব্বোদ্ধত হইয়া ধরাকে সড়া জ্ঞান কবিতেছে; সে এখন এই সমস্ত ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর লোক অপেক্ষা নিজেকে অনেক উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া সকলের সহিত চোখ নামাইয়া কথা বলিতে ঘৃণা বোধ করিতেছে। তাহার এখন কি বেশভূষা—কি জাঁকজমক! সে কর্ত্রীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে—বড় ম্যানেজারী ত' তাহার প্রায় করকবলিত—তাহাকে আর পায় কে?

বলাবাহুল্য, মনোমোহনের আর্থিক সাচ্ছল্যের সহিত নেশাআসক্তিও বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্রীর প্রিয় পাত্র হইতে যাহা কিছু আবশ্যক—যতই ঘৃণ্য, পাশবিক হউক না কেন—সমস্তই করিতে সে দৃঢ়পরিকর হইয়াছে। যাহার একবার পতন

হয়—যে একবার হৃদয়ের উচ্চবাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আকাঙ্খার দাস হইয়া কামনার অনলশিখায় মনের সমস্ত সৎবৃত্তিগুলি আহুতি দিতে প্রস্তুত হয়—তাহার এ সংসারে অসাধ্য কোনও কুকর্ম্মই থাকে না—সে কোনও জঘন্য ক্রিয়া হইতে পশ্চাদ্‌পদ হয় না।

মনোমোহনের উর্ব্বর মস্তিষ্কে নানাবিধ দুর্ব্বুদ্ধি খেলিতে লাগিল। রমেশচন্দ্রের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে না পারিলে জমিদারিণীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করিতে পারিতেছে না—কাজেই রমেশচন্দ্র ও সুনীতিকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিবার জন্য নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে, চিন্তা করিতে করিতে একটা উপায় উদ্ভাবনা করিল এবং কর্ত্রীর সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ করিয়া—সেই নারকীয় অভিসন্ধি আঁটিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ত্রীও যেন এক্ষণে নেশা-বিহ্বল—তাঁহার আর ভালমন্দ বিবেচনার শক্তি নাই—তিনি রমেশচন্দ্র ও সুনীতির প্রতিহিংসায় অন্ধ; মনোমোহন তাঁহার যুক্তি দাতা ও পথ প্রদর্শক, মনোমোহন যে বুদ্ধি দিতেছে—যে পথে চালাইতেছে—তাহাই বিমূঢ়া রমণী আগ্রহের সহিত আঁকড়িয়া ধরিতেছে।

কর্ত্রীর আদেশ লইয়া মনোমোহন রমেশচন্দ্রের কার্য্য কলাপ পরিলক্ষণ করিবার জন্য চড়ের মহালে উপস্থিত হইল। রমেশ-চন্দ্র ও সুনীতি তাহাকে হঠাৎ পাইয়া আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেলেন। এই দূর স্থানে—অসভ্য অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে বাস করিতে করিতে একজন ভদ্র সন্তান স্নেহের পাত্রের সাক্ষাৎ লাভে কে না আনন্দিত হয়? তারপর রমেশচন্দ্র ও সুনীতি উভয়েই মনোমোহনের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ—মনো-মোহনের প্রতি তাঁহাদের বিশ্বাস ও প্রীতি অপরিসীম। তাই

যখন মনোমোহন মনের অভিসন্ধি গোপন করিয়া মুখে বলিল যে সে শুধু তাঁহাদের সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে, যে তাঁহাদের স্নেহ ও ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইয়া সে নিতান্ত অশান্তিতে দিন যাপন করিতেছে—তখন রমেশচন্দ্র কি সুনীতি কেহই তাহাকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না, এবং তাঁহাদের প্রতি মনোমোহনের অকৃত্রিম অনুরাগের নিদর্শনে তাঁহারা তাহাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিল। কিরূপে তাহাকে যত্ন করিবে, কিরূপে এই প্রিয় অতিথি ও সুহৃদবরের যথাসাধ্য যত্ন পরিচর্য্যা করিবে, সে চিন্তায় স্বামী স্ত্রী ব্যতিব্যস্ত হইল।

মনোমোহন রমেশচন্দ্রের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহ পরিদর্শন করিতে লাগিল এবং আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করিয়া সর্ব্বকার্য্যে সহানুভূতি দেখাইতে লাগিল।

মনোমোহন দেখিল—এ দম্পতি কি উচ্চ হৃদয়, কি জন-হিতৈষী; আরও দেখিল স্বামী স্ত্রীতে কি অপূর্ব্ব গাঢ় প্রীতি, কি পবিত্র নির্ম্মল প্রেমের বন্ধন—পরস্পরে কি গভীর অনুরাগ ও আসক্তি। তখন তাহার বড়ই অনুতাপ হইল যে এই অপূর্ব্ব দম্পতির শত্রুতা সাধনে, বিপদ সংঘটনে সে প্রবৃত্ত হইয়াছে! কিন্তু সেই অনুতাপ দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না—উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ চিত্রের দিকে তাহার দৃষ্টি পড়িল—সে এত দূর অগ্রসর হইয়া কখনই সেই সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করিতে পারে না; পরের প্রতি ভালবাসার জন্য নিজের অদৃষ্টকে কে ধ্বংস করে? মনোমোহন তাহার অভিসন্ধি সাধনার্থ অটল, অবিচল হইয়া নিজ পথ অনুসরণ করিতে লাগিল।

একদিন রমেশচন্দ্র আহারান্তে মনোমোহনের সহিত নানা

বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে এই চড়ের অশিক্ষিত লোকদিগকে উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার কি কি কার্য্য করা ইচ্ছা, তাহা বলিতে লাগিলেন। বলিলেন—যে ইহাদের শিক্ষিত করিবার আগে, ইহাদের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা প্রথম আবশ্যক। একটি উত্তম জলের পুষ্করিণী খনন করা ও একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা নিরতিশয় প্রয়োজন। কিন্তু তাহাতে বহু টাকার দরকার; কর্ত্রীর সহানুভূতি ও কৃপা থাকিলে সম্পাদিত হইতে পারে।

মনোমোহন ঐ প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়া বলিয়া উঠিল—"দাদা এ চমৎকার কথা, এই কার্য্যটী করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহা সম্পন্ন করতে পারলে এই সকল লোক দিগের একটি বিশেষ উপকার করা হবে। ইহাতে জমিদারিণীর সহানুভূতি থাকবে না কেন? তাঁহার প্রজারা সুখে থাকলে তাঁহারই সুনাম ও সর্ব্বরকমে লাভ। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আমি এই কার্য্য সম্পন্ন হ'তে যে টাকা লাগবে, তা এষ্টেট হ'তে দেওয়ার জন্য কর্ত্রীর মঞ্জুরী নিয়ে দেব।

রমেশচন্দ্র বলিলেন—"তুমি কি তা পারবে ভাই? যদি পার, একটা কাজের মত কাজ হয়। আমিতো কর্ত্রীর কাছে কিছু প্রস্তাব করতে সাহস পাই না। বড় বাবুকে দিয়ে অনুরোধ করা'তেও সাহস হয় না। শুনেছি, তোমাকে সম্প্রতি কর্ত্রী একটু স্নেহচোখে দেখেন—তুমি পারলেও পারতে পার।

মনোমোহন যেন একটু লজ্জা পাইল—কি বলিবে, ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, পরক্ষণেই রমেশচন্দ্রের মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দেখিল যে তাঁহার মনে কোনও রূপ অন্য ভাবের সঙ্কেত নাই; সরল লোক সরলভাবেই কথা কয়টি বলিয়াছে। তখন

তাঁহারও মনে পড়িল যে রমেশচন্দ্রের মত লোকের মনে অন্যরূপ সন্দেহ কি মন্দ ধারণা আসিতেই পারে না।

তাই, একটু হাসিয়া বলিল—হাঁ, দাদা, আমি কয়েকটি কাজে কর্ত্রীর জন্য খুব খেটেছি বলে' তিনি আমাকে একটু অনুগ্রহের চোখে দেখছেন।"

"তা দেখবেন না? যে তোমার চরিত্রের, পরসেবার প্রবৃত্তির পরিচয় পেয়েছে, সেই তোমার হবে।"

"দাদা, সে আপনাদের আশীর্ব্বাদ। তবে কথা কি আমি পরের কষ্ট দেখতে পারি না, দেখলেই তার জন্য প্রাণ দিতে ইচ্ছা হয়। সে যাক, আপনার কত টাকার দরকার, বলুন—আমি আজই কর্ত্রীর কাছে লিখে অনুমতি আনাচ্ছি।"

রমেশচন্দ্র উৎসাহিত হইলেন এবং কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন—"টাকা যে কত লাগবে, তা এখন ঠিক বলা যায় না, তবে সম্প্রতি ২০০০৲ টাকার মঞ্জুরী পেলে কাযে নামতে পারি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রজাদের কাছ হতেও কিছু কিছু টাকা সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে পারি।

মনোমোহন হাসিয়া বলিল—"মাত্র ২০০০৲ টাকা? তার জন্য চিন্তা কি, আমি ৪ দিনের মধ্যেই তা মঞ্জুর করিয়ে আনছি।"

মনোমোহন সেই দিনই পত্র লেখিল—এবং ঐ পত্র রমেশ-চন্দ্রকে পাঠ করিয়া শুনাইল। পরে এক পত্রবাহক দ্বারা ঐ পত্র পাঠানো হইল এবং উত্তর লইয়া আসিবার জন্য উপদেশ দেওয়া হইল।

ঐ পত্রের সহিত মনোমোহন গোপনে আর একখানা পত্র কর্ত্রীর নিকট দিয়াছিল। রমেশচন্দ্র তাঁহা জানিতে পারিল না।

চারিদিনের দিন পত্রের উত্তর আসিল। কর্ত্রী সম্মত হইয়া এষ্টেট হইতে টাকা পাইবার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া—রমেশচন্দ্রকে তাহার নিজ মহালের তহবিল হইতে ঐ টাকা ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছেন। এই পত্রোত্তর পাইয়া রমেশচন্দ্র মনোমোহনকে ধন্যবাদ দিলেন এবং সোৎসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। মনোমোহন তাহার পর আরও কয়েকদিন তথায় থাকিয়া রমেশচন্দ্রের সহায়তা করিল ও পরে 'দাদা' ও 'বৌদিদিকে' তাহাদের আদর যত্ন ও অতিথ্যের জন্য সহর্ষচিত্তে শত শত ধন্যবাদ দিয়া সদরে চলিয়া গেল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যারে হেরি বিষচোক্ষে তার গুণে জ্বালা বাড়ে
তারে খর্ব্ব করিবারে, আপনার হিত ছাড়ে।

মনোমোহন ফিরিয়া আসিয়া সমস্ত বিষয় জ্ঞাপন করিল। যদিও রমেশচন্দ্রের পদখর্ব্বতা হইয়াছে, যদিও তাহার মাহিনা অনেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তবুও কিরূপে তাহারা স্বামাস্ত্রী নিজেদের চরিত্রগুণে সমুদয় প্রজার হৃদয় অধিকার করিয়া অপরিমিত আনন্দ ও সুখশান্তিতে জীবনযাপন করিতেছে, তাহাও বিস্তৃত বিবরণ সহ বলিল। কর্ত্রীর গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। তাঁহার যন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি হইল এই ভাবিয়া, হায় আমি উহাদের নিগৃহিত ও বিপদগ্রস্ত করিতে যতই চেষ্টা করিতেছি, ততই উহারা সুখস্বচ্ছন্দতার ব্যবস্থা করিয়া লইতেছে। তাঁহার প্রতিহিংসা ও জিদ দ্বিগুণ বাড়িল এবং কিরূপে তাহাদের এই সুখের জীবন ধ্বংস করা যায়, তাহার পরামর্শ মনোমোহনের নিকট চাহিলেন। নিতান্ত ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন—"মনোমোহন, তোমার জন্য এত করলাম, তোমাকে আমার সম্পূর্ণ অনুগ্রহ প্রদান করতেও আমি প্রস্তুত। কিন্তু তুমিতো তোমার অঙ্গিকার রক্ষা করার কিছুই এ পর্য্যন্ত করতে পাবলে না। তোমার চিঠি অনুসারে টাকা মঞ্জুর করলাম—তাতেই বা কি হলো, কিছুই বুঝছি না।

মনোমোহন হাসিয়া কহিল—"আমি কি অবথা সেখানে গিয়েছিলাম? একটা ফন্দী এঁটেই গিয়েছিলাম। টাকা মঞ্জুরও

একটা উদ্দেশ্যে করিয়েছি। পথ পরিষ্কার করে এসেছি—এখন বড় ম্যানেজার বাবু দূরে সরলেই কার্য্যোদ্ধার করবো।

কর্ত্রী নিতান্ত তুষ্ট হইলেন এবং আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি ক'রে এসেছ? সুনীতির কি?

মনোমোহন বাধা দিয়া বলিল—"চলুন ঐ কক্ষে, আমার অভিসন্ধির সমস্ত কথা আপনায় বলছি।

পরে অপর এক নিভৃত কক্ষে উভয়ে নিরালায় বসিয়া অস্ফুট-স্বরে অনেক কথা হইল, তাহার মর্ম্ম এক্ষণে বলিতে আমরা অক্ষম।

তাহার পর দুই মাস অতীত হইল। ইতিমধ্যে বড় ম্যানেজারের প্রতিপত্তি অনেক ন্যূনতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এষ্টেটের কর্ত্তা একরকম মনোমোহন। ম্যানেজার এই অবস্থায় এষ্টেটে কার্য্য করিতে নিরতিশয় অনিচ্ছুক। আবার এমন সময় তাঁহারও শরীর কিছু অসুস্থ হইয়া পড়িল। তিনি সেই সুযোগে ছয় মাসের ছুটী চাহিলেন—এত দীর্ঘ ছুটী চাহিবার অর্থ—তিনি আর এই এষ্টেটে কাজ করিবেন না,—এইসময় মধ্যে অন্যত্র কার্য্য যোগাড় করিয়া লইবেন।

কর্ত্রী ও মনোমোহন এই সুযোগই চাহিতেছিল। ছুটী মঞ্জুর হইল। বড় ম্যানেজার কার্য্যের ভার অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন; মনোমোহন সেই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিল। যদিও নামে বড় ম্যানেজার হইল না, কার্য্যতঃ মনোমোহনই বড় ম্যানেজার হইল। তাহার আকাঙ্ক্ষা প্রায় পূর্ণ হইল, জীবনের উদ্দেশ্য প্রায় সিদ্ধ হইল।

সমস্ত মহালে ও কর্ম্মচারীগণের নিকট প্রকাশ করা হইল যে কর্ত্রী স্বয়ং জমিদারীর শাসনকার্য্য করিবেন। এই সংবাদ রমেশ-

চন্দ্রের নিকট পৌঁছিতেই তাঁহার ভীতিসঞ্চার হইল। বড় ম্যানেজার বাবু তাঁহাকে নিরতিশয় অনুগ্রহ ও প্রীতির চোক্ষে দেখিতেন এবং বিপদে আপদে আশ্রয়স্বরূপ ছিলেন। এখন কর্ত্রী স্বয়ং সমস্ত কার্য্যের ভার নিজ হস্তে লইলেন—তাঁহার রমেশচন্দ্রের প্রতি যেরূপ আক্রোশ ভাব তাহাতে যে তিনি কি করিবেন সেই চিন্তায়ই রমেশচন্দ্র বিশেষ ভীত হইলেন। অনন্যোপায় হইয়া ভগবানের নাম ধরিয়া হৃদয়ে ভরসা সঞ্চারপূর্ব্বক দিন যাপন করিতে লাগিলে।

বড় ম্যানেজারের যাওয়ার পর দুই মাস অতীত হইল। এই সময়ের মধ্যে কর্ত্রী বিশেষভাবে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। রমেশচন্দ্র পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিত আশ্বস্ত হইয়া তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মে কটি বাঁধিয়া পরিশ্রম করিতেছেন। পুষ্করিণী খনন আরম্ভ হইয়াছে এবং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার যথাবিধি আয়োজন চলিতেছে ও সঙ্গে সঙ্গে একটি বিদ্যালয় স্থাপনেরও চেষ্টা হইতেছে। কর্ত্রীর আদেশপত্র ও মনোমোহনের কথার উপর নির্ভর করিয়া মহালের তহবিল হইতে টাকার কাজ চালানো হইতেছে এবং প্রজাবৃন্দ হইতে টাকা সংগ্রহ করা হইতেছে। বহু টাকার ব্যাপার; বহু টাকা ব্যয় হইতেছে। রমেশচন্দ্র কর্ম্মোৎসাহে মত্ত হইয়া অবাধে মহালের তহবিল হইতে টাকা ব্যয় করিতেছেন; তাঁহার ধারণা যে আপাততঃ আরব্ধ কার্য্যত শেষ হইয়া যাউক, পরে ক্রমশঃ প্রজাকুল হইতে টাকা সংগ্রহ করিয়া তহবিল পূরণ করিলেই হইবে। প্রজাগণ হইতে এত টাকা এককালে আদায় করা সুকঠিন এবং সেই টাকার ভরসায় কার্য্যে অগ্রসর হইলে, কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে না বিশেষ মহালের উন্নতি উদ্দেশ্যে, প্রজাদিগের হিতকর কার্য্যে

টাকা ব্যয় হইতেছে, আর যখন তাহাতে ভূম্যধিকারিনীর লাভ ও যশঃ তখন আর তাহাতে ইতস্ততঃ করিবার কি আছে ?

এইরূপ বিচার করিয়া রমেশচন্দ্র অতিশয় উদ্যম ও উৎসাহের সহিত যাহাতে পুষ্করিণী খনন ও হাসপাতাল স্কুল প্রভৃতি স্থাপন এক বৎসরের মধ্যে নিষ্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। কিন্তু এদিকে যে তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র পাকা হইতেছে, তাহা তিনি ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিতেছেন না—তিনি আপনার আনন্দেই বিভোর হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, এবং স্ত্রীর সাহায্যে ও সাহচর্য্যে অধিকতর উৎসাহিত ও উৎফুল্ল হইয়া কর্ম্মে মাতিয়াছেন।

এইরূপে কার্য্য চলিতেছে—হঠাৎ একদিন মনোমোহন পুনরায় তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

হিতৈষী বন্ধুর সঙ্গ, কে ছাড়িতে পারে ?
ছাড়িতে রমণী নর ভাসে অশ্রু ধারে।

মনোমোহন কয়েক দিন থাকিয়া রমেশচন্দ্র ও সুনীতির জনহিতকর বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠানে আনন্দ প্রকাশ করিয়া ও উৎসাহ প্রদান করিয়া চলিয়া গেল। রমেশচন্দ্র মনোমোহনের কথাও কথার আভাসে কর্ত্রী এই সকল কার্য্যে নিরতিশয় প্রীত হইতেছেন বুঝিয়া অধিকতর উৎসাহে পরিশ্রম করিতেছেন। স্কুলগৃহ প্রায় সম্পন্ন হইয়াছে, হাসপাতালের গৃহের কার্য্য খুব জোরে চলিতেছে, পুষ্করিণী কাটা হইয়াছে, পাড় বাঁধানো, সিঁড়ি নির্ম্মানের কাজ চলিতেছে। প্রজাবর্গ রমেশচন্দ্রের কর্ম্মে তাঁহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছে এবং এমন সুবিবেচক দয়াশীল কর্ম্মচারী যে জমিদারিণী দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার প্রতি তাহাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা বাড়িতেছে।

এইরূপে দিন যাইতেছে—সহসা একদিন সদর হইতে এক পত্রবাহক আসিয়া উপস্থিত হইল। কর্ত্রীর আদেশ—রমেশচন্দ্র পত্র পাওয়া মাত্র সস্ত্রীক সদরে পৌঁছিবেন, বিশেষ আবশ্যক। রমেশচন্দ্রের চিত্ত আশায় নাচিয়া উঠিল—তাঁহার মনে হইল কর্ত্রীর মন ফিরিয়াছে, তাঁহার কার্য্যকলাপে কর্ত্রীর আক্রোশ ভাব দূর হইয়াছে—বোধ হয় তাঁহাকে ম্যানেজারী পদে, না হয়, পুনরায় সব ম্যানেজারী পদে নিযুক্ত করিবেন। সুনীতির কিন্তু, কেন যেন

আতঙ্ক উপস্থিত হইল—তাহার বোধ হইতে লাগিল—এখানে বেশ ছিলাম, বুঝি আবার কোনও বিপদে পড়িতে হইবে। কিন্তু উপায় নাই—আদেশ যখন আসিয়াছে তখন যাইতেই হইবে।

রমেশচন্দ্রও পত্নীর আশঙ্কার বিষয় শুনিয়া কিছু সন্দিহান হইলেন—তাঁহারও এক একবার মনে হইতে লাগিল যে যে কাল ভুজঙ্গিনী তাহাদের গ্রাস করিতে ফণা বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে, সে যে তাহার প্রতি সহজে প্রসন্না হইবে, তাহা বিশ্বাস হয় না; কিন্তু আশা মনোমোহিনী মায়াময়ী, আশার তরল ঝঙ্কারে সে সন্দেহ হৃদয়ে স্থায়ী হইতে পারিল না। আশা তাঁহার কাণে কাণে বলিতে লাগিল—মনোমোহন তাহাদের হিতৈষী। তাহার কথায় নিশ্চয়ই কর্ত্রীর মন ফিরিয়াছে, নিশ্চয়ই রমেশচন্দ্রের আবার উন্নতি হইবে।

সে যাহাই হউক, কপালে যাহাই থাকুক, আদেশানুসারে রমেশচন্দ্র সপরিবারে সদরে যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহাতে প্রজাকুল নিতান্ত দুঃখিত হইল; তাহারা বলিতে লাগিল, তাহারা সমবেত হইয়া সদরে যাইয়া আবেদন করিবে; তাহারা কিছুতেই এইরূপ মাবাপ তুল্য হিতৈষী নায়েব, নায়েব পত্নীকে হারাইবে না।

রমেশচন্দ্র তাহাদের বলিলেন যে তিনি সদরে যাইয়া আগে বুঝিবেন যে কর্ত্রীর অভিপ্রায় কি—তারপর যেন তাহারা যেরূপ করার করে। তিনি আরও প্রজাদের বুঝাইলেন—যে তিনি যদি ম্যানেজার কি সব ম্যানেজার হন, তাহা হইলেও তাহার মন ও দৃষ্টি এই মহালের প্রতি আকৃষ্ট থাকিবে এবং যাহাতে এই মহালের উন্নতি হয়, প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি পায় এবং এই সকল আরব্ধ কার্য্যাদি সুচারু রূপে সম্পন্ন হয়, তাহা করিবেন। এই

কথায় প্রজাগণ অনেকটা আশ্বস্ত হইল কিন্তু তাহাদের হৃদয়ে যথার্থই একটা অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহারা প্রকৃতই রমেশচন্দ্রকে ভালবাসিত ও তাঁহার কথায় ও সংস্পর্শে সত্যই বিপুল আনন্দ অনুভব করিত; তাই তাহাদের প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, রমেশচন্দ্রকে বিদায় দিতে হইবে জানিয়া, তাহাদের দুঃখসিন্ধু উচ্ছুসিত হইয়া উঠিল।

প্রজাদিগের রমণীগণ সুনীতির মিষ্ট আলাপ ও ব্যবহারে, তাঁহাকে মায়ের মত ভক্তি করিত ও ভালবাসার চোক্ষে দেখিত। বালক বালিকারা তাঁহাকে আপনাদের মা মাসী অপেক্ষা অধিক আপন মনে করিত। সুনীতি তাহাদের ছাড়িয়া যাইবে ইহা শুনিয়া তাহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল—তাহারা সকলে সুনীতির কাছে আসিয়া আকুল ব্যকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল। সুনীতি বস্ত্রাঞ্চলে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহাদিগকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিলেন। বলিলেন—যিনি মনীব, তাঁহার আদেশ, কাজেই বাধ্য হইয়া যাইতে হইতেছে, নতুবা তাহাদিগকে লইয়া আনন্দে জীবন যাপন করিতেন; সে যাহা হউক, যেখানেই থাকুন, তাহাদের কথা মনে থাকিবে।

এইরূপে প্রজাদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া রমেশ-চন্দ্রও সুনীতি চড়ের কাছারী ত্যাগ করিয়া সদরে রওনা হইলেন; প্রজাকুল চোখের জল মুছিতে মুছিতে নিজ নিজ বাড়ী ফিরিয়া গেল।

এখানে একটি কথা বলিতে হইতেছে। রমেশচন্দ্র এই মহালে প্রায় দুই বৎসর কাল ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তাহাদের আর একটি পুত্র জন্মিয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স এখন প্রায় তিন মাস।

———

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অল্প বুদ্ধি জন যদি লোভ মুগ্ধ হয়,
পায়না সিদ্ধির পথ, বুদ্ধি হয় লয়।

রাত্রি প্রায় ১২টা—গভীর রাত্রি সত্য কিন্তু অন্ধকার রাত্রি নয়। জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর হাসির তরঙ্গে চতুর্দ্দিক হাস্যময়। জমিদারিণী ব্রহ্মময়ী কতক্ষণ শয্যায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া বসিলেন—কি জানি কেন ঘুম আসিল না। মনে শান্তি নাই। কিছু গরম বোধ হইতে লাগায়, মাথার কাছের জানালাটা খুলিয়া দিলেন—অমনি কতগুলি জ্যোৎস্নার ঢেউ কক্ষে ঢুকিয়া দূর-প্রান্তবর্ত্তী কক্ষের বাতিটিকে নিস্প্রভ করিয়া দিল। কর্ত্রীর বুকে যাইয়াও ঐ জ্যোৎস্নাগুলি বাজিল। আকাশে, ভুবনে, তরু, লতা, নদী মাঠে সর্ব্বত্র জ্যোৎস্নার হিল্লোল খেলিয়া বেড়াইতেছে। বুঝি জ্যোৎস্নার সঙ্গে মানব চিত্তের খুব নিকট সংযোগ আছে, নতুবা জ্যোৎস্নার তরঙ্গে নরনারীর প্রাণ নাচিয়া উঠে কেন, তরঙ্গায়িত হয় কেন?

ব্রহ্মময়ীর বুকে কি যেন একটা অভাব জাগিয়া উঠিল—কি যেন একটা অতি ঈপ্সিত কিন্তু অভুক্ত সম্ভোগের সাধ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এইরূপ হইতেই—রমেশচন্দ্রের সুকুমার সুঠামকান্তি তাঁহার চোখের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। কর্ত্রী নিজের বুক নিজে চাপিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হায়, রমেশ তুমি কেন আমার সংসারে চাকরী করতে এসেছিলে—কেন তুমি

আমায় এমন করলে? যদি আমার হৃদয়ে নূতন আকাঙ্খা জাগালে, তবে কেন তাহা পূর্ণ করলে না? কেন আমায় উন্মত্তা ক'রে আমার প্রাণের আগুণে আমায় জ্বালাচ্ছো? হায় তোমার জন্য..." এমন সময় দ্বারের বাহিরের শিকলে খট্‌খট্ শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। বুঝিলেন—বামা দাসী আসিয়াছে। দরজা খুলিয়া দিলেন—বামা কক্ষে প্রবেশ না করিয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল—মনোমোহন বাবু এসেছেন, দেখা করতে চান।

কর্ত্রী কিছুক্ষণ ভাবিলেন, পরে বলিলেন--'না, বল্ গিয়ে আজ আমার মন ভাল নাই।"

বামা বলিল—"কি নাকি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা আছে।"

"এঁ্যা, কথা আছে? আচ্ছা যা, নিয়ে আয়।"

বামা চলিয়া গেল। কর্ত্রী দ্বার অর্দ্ধরুদ্ধ রাখিয়া পালঙ্কে যাইয়া বসিলেন।

মনোমোহন হাসিতে হাসিতে কক্ষে প্রবেশ করিল—বরাবর পালঙ্কের উপর যাইয়া কর্ত্রীর নিকটে বসিল। ব্রহ্মময়ীর আজ উহা ভাল লাগিল না—বলিলেন—"যাও, তুমি কোন কাজের নও, তোমাকে আমার সব দিলাম, কিন্তু আমার সাধ পূর্ণ করতে পারলে না।"

ব্রহ্মময়ীর কণ্ঠস্বরে যথেষ্ট ক্ষোভ ও রোষ ভাব ছিল। তাহাতে মনোমোহন জড়সড় হইয়া গেল; কিছু সরিয়া বসিয়া বলিল—"কেন কর্ত্রি, কেন ব্রহ্মময়ি, আমি কি তোমার জন্য কম করছি আমি তো যথাসাধ্য সুনীতিকে......।"

কর্ত্রী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"দূর ছাই সুনীতির সর্ব্ব-

নাশে আমার কি হবে? আমি যা চাই, তা পাই কোথায়? আর সুনীতির সর্ব্বনাশ—তাই বা করতে পারলে কোথা?

মনোমোহন কিঞ্চিৎ ফাঁফরে পড়িয়া গেল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে ব্রহ্মময়ী সুনীতির সতীত্ব গৌরব ধ্বংস করিয়া কেবল রমেশচন্দ্রকে জব্দ করিতে ও শিক্ষা দিতে চায়। ইহার অধিক যে আর কিছু ব্রহ্মময়ী চায়, তাহা সে জানিত না, বা বুঝে নাই। তাই হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ কর্ত্রীর প্রতি চাহিয়া থাকিয়া বলিল— "সুনীতির গৌরব ধ্বংসের আয়োজন করছি, ব্রহ্মময়ী, কিন্তু তুমি আবার কি চাও, তাতো জানি না।

"আমি কি চাই? যাক্, সে কথায় কাজ নাই। আচ্ছা, সুনীতির গর্ব্ব খর্ব্ব হলেই আমি তুষ্ট হই। তার, কি আয়োজন করেছ? আয়োজন, আয়োজন, অনেক দিন হতেই ত শুনছি।

ব্রহ্মময়ীর কথার টানগুলি আজ মনোমোহনেরও ভাল লাগিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল—কর্ত্রী যেন আর তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না। তাই কিঞ্চিৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—"এইবার দেখবে ব্রহ্মময়ী, তুমি অযথা তোমাকে আমায় দান করেছ কি না। পূর্ব্বে যে ভেবেছিলাম, রমেশকে নিকাশের দায়ে ফেলে টাকা তশ্রুপের অপরাধে জেলে পাঠিয়ে, সুনীতিকে হস্তগত করবো, সে মতলব এখন ছেড়ে দিয়েছি, তাহাতে বহু বিলম্ব হবে। আজ যে ফন্দী করেছি, তাতে আর কার্য্যসিদ্ধি হ'তে সময় লাগবে না।"

কি ফন্দী করেছ, শুনতে পাই কি? অনেক ফন্দীই ত অনেক সময় করলে।

মনোমোহন উত্তেজনায় দাঁড়াইয়া পড়িল—"না, আজ তাহা

বলবো না। দুই একদিনের মধ্যে কর্ম্ম কার্য্যেই বুঝতে পারবে” কিছু রোষপূর্ণ কণ্ঠে এইরূপ বলিয়া মনোমোহন চলিয়া গেল। কর্ত্রী কিছু চিন্তিত হইলেন—অবশেষে আপন মনে “কি জানি কি সর্ব্বনেশে বুদ্ধি করেছে” বলিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভ্রান্তমতি দুষ্টলোক না বুঝিয়া শেষ।
করে কাণ্ড, পরিতাপ যাহাতে অশেষ॥

তার পরের দিন রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় রমেশচন্দ্র সপরিবারে গোযানে রাধানগর গ্রামের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যখন পথ পার্শ্বের এক দোকান ঘরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন পূর্ব্বদিকে গাছের আড়ালে কেবল চাঁদ ডুবিতেছিল এবং পথে লোক চলাচল বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। রাধানগর হইতে জমীদার বাড়ী প্রায় পাঁচ ক্রোশ—রাস্তা ভাল, তবে মধ্যে অনেকটা রাস্তা ঠিক গ্রামের মধ্য দিয়া না যাইয়া জনশূন্য মাঠ ও অরণ্যের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলটি ব্রহ্মময়ীর জমীদারীর এলাকায়ই; রমেশচন্দ্র পূর্ব্ব হইতেই এ স্থানটি বেশ জানিত। এই পথে অনেক সময় অনেক পথিকের দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে—তবে সে বহুদিন পূর্ব্বে, গত দশ পনোর বৎসরের মধ্যে কাহারও কোন রূপ দুর্ঘটনা হওয়া শুনা যায় নাই। তবুও রমেশচন্দ্রের প্রাণটা কাঁপিয়া উঠিল; তিনি একটু ভীত হইয়া গরুগাড়ীর গাড়োয়ানকে বলিলেন—"কি হে গাড়োয়ান, কিরূপ বুঝ, গাড়ী কি চালাবে, না, রাত্রিটা এখানেই গাড়ী ধরবে?

গাড়োয়ানের বুঝিতে বাকী রহিল না যে বাবুর কিছু ভয় হইতেছে, তাই সে সাহস ব্যঞ্জক হাসির স্বরে অথচ বিনয়ে বলিল—'কেন বাবু, ভয় কি? এপথে এখন আর কোন ভয় নাই।

বিশেষ এ আপনাদেরই এলাকা—দুই দিকের লোক সব আপনাদেরই প্রজা।

রমেশচন্দ্র আবার বলিলেন—তা জানি, তবুও ছেলেপুলে স্ত্রীলোক নিয়ে যাচ্ছি, রাত্রে একটু সাবধানে যাওয়াই ভাল; বিশেষ সম্মুখে অনেকটা পথ বড় নির্জ্জন। গাড়ীচালক সজোরে ভরসা দিয়া বলিল—"বাবু কিছু ভয় নাই। তারপর আমরাও একা নই, আমাদের দুই গাড়ীর কাছে আসবে কে? অযথা কেন পথের মধ্যে পড়ে থাকবো, বরাবর চ'লে গেলে ভোর হ'তে না হ'তেই জমিদাব বাড়ী পৌঁছিব। তা না হ'লে, পৌঁছিতে দুপুর হবে।

এখানে বলা আবশ্যক যে রমেশচন্দ্রের সঙ্গে দুইখানি গাড়ী ছিল—এক খানিতে উঁহারা নিজেরা ছিলেন, দ্বিতীয় খানিতে মালপত্র ছিল।

গাড়োয়ানের শেষ কথায় রমেশচন্দ্র ভাবিতে লাগিল—"একথা ঠিক, বরাবর চলে গেলে রাত্রি শেষেই জমিদার বাড়ী পৌঁছান যাবে, নতুবা অনেক বেলা হয়ে যাবে, তাতে ছেলেপুলের খুব কষ্ট হবে। থাক্ তবে, থেকে কাজ নাই, চলে যাই। এখন আর ভয় আশঙ্কা নাই।

পরে বলিলেন—'আচ্ছা তবে যাও, অনর্থক পথে রাত্রি যাপন ক'রে কি হবে?

সুনীতি স্বামীর পশ্চাদ্ভাগে বসিয়া স্বামী ও গাড়োয়ানের কথা সভয়চিত্তে শুনিতেছিলেন। ছেলে দুইটী তখন গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত।

রমেশচন্দ্রের শেষ কথা পর্য্যন্ত নির্ব্বাক হইয়া শুনিয়া সুনীতি

মৃদু কণ্ঠে বলিল—"যদি ভয়ের কোন কারণ থাকে, তবে কাজ কি যেয়ে, এখানেই থাকা যাক, না হয় কা'ল কিছু বেলা হবে।

রমেশচন্দ্র সস্নেহে স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া বলিলেন—'না, এখন কোনও ভয়ের কারণ নাই, এখন আর সে সব নাই—অনেক আগে ছিল।

তারপর আর কেহ কিছু বলিল না—গাড়ী চলিতে লাগিল। প্রায় দুই ঘণ্টার পর গাড়ী যখন মাঠের মধ্য দিয়া যাইতেছিল, এবং রমেশ ও সুনীতি উভয়ই নিদ্রালু হইয়া পরস্পরকে এক রকম জড়াইয়া ধরিয়া শায়িত ছিলেন কারণ গাড়ীর সম্মুখে একখানা পর্দ্দা ঝুলানো ছিল এবং স্বল্পায়তন গাড়ীর মধ্যে দুটী ছেলেকে ভালমত শোয়াইয়া, উঁহাদের একদিকে জড়সর হইয়া না শুইলে, আর শোওয়াও যায় না—

এমন সময় সম্মুখস্থ বনের অন্তরাল হইতে সাত আট জন লোক 'মার্' 'মার্' করিয়া বিকট শব্দে গাড়ীর উপর আসিয়া পড়িল এবং ধপাধপ করিয়া গাড়ীর ছইর উপর লাঠির বাড়ি মারিতে আরম্ভ করিল। গাড়োয়ানরা প্রাণের ভয়ে গাড়ী গরু ছাড়িয়া যে যেদিকে পারিল, পলাইয়া গেল। গরুগুলি কাঁধ হইতে গাড়ি ফেলিয়া দিয়া ছট্‌ফট করিতে লাগিল; দস্যুরা আসিয়া গাড়ির উপর উঠিল ইতি মধ্যে রমেশচন্দ্র ও সুনীতি জাগিয়া উঠিয়াছে এবং আকস্মিক বিপদে ছেলে দুটীকে বুকে লইয়া ভয়ে ও ভাবনায় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে। দস্যুরা গাড়ির উপর চড়িয়া ছইর ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা করিতেই সুনীতি দুই হাতে রমেশচন্দ্রকে জড়াইয়া ধরিল এবং রমেশচন্দ্র স্ত্রী ও পুত্র দুইটীকে দুই হাতে আপনার বুকের মধ্যে লইয়া ব্যাকুল স্বরে

বলিতে লাগিল—"ভাইরা, তোমাদের যা ইচ্ছা, নিয়ে যাও—আমার বাক্স পেটেরা টাকা পয়সা অলঙ্কার যা কিছু আছে, সব নিয়ে যাও, কিন্তু তোমাদের পায়ে ধরি, আমাদের কিছু করো না—আমাদের গায়ে হাত দিও না।" কিন্তু এ কি! দস্যুরা তো পশ্চাতের গাড়ীতে গেল না, তাহারা ত বাক্স পেটেরা ধরিয়া টানাটানি করে না! তাহারা যে সকলে আসিয়া এই গাড়ীর ছই ভাঙিয়া ফেলিয়া সুনীতিকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! হায়, হায়, সুনীতিকে হরণ করিলে যে সব যাইবে। না. না! প্রাণ থাকা পর্য্যন্ত তাহা কখনই হইতে পারিবে না। রমেশচন্দ্র দাপ্ত হইয়া উঠিল, কাতর স্বর ছাড়িয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং নিজের প্রাণ পণ করিয়া স্ত্রীকে বাহু আলিঙ্গনে জড়াইয়া ধরিয়া দস্যুদের সহিত সিংহ বিক্রমে যুঝিতে লাগিল। ছেলেরা সেই হুড়াহুড়িতে দূরে ছুটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সুনীতি সমস্ত গায়ের জোর দিয়া এক হস্তে রমেশচন্দ্রকে আঁটিয়া ধরিয়া অপর হস্তে ছেলে দুটাকে টানিয়া লইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। দস্যুরা যখন দেখিল যে সহজে স্ত্রীকে স্বামী হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতেছে না—তখন ধমাধম করিয়া রমেশচন্দ্র ও সুনীতির অঙ্গে চারি পাঁচটা লাঠির আঘাত বসাইয়া দিল। উভয়েই সেই আঘাতে হৃতচেতন হইয়া লুটাইয়া পড়িল। তারপর কি হইল—ছেলেদের দশা কি হইল—তাহা দেখিবার কি জানিবার অবস্থা তাহাদের আর রহিল না।

হায়, দুষ্ট লোকের বুদ্ধির দোষে পবিত্র দম্পতির উপর একটা ভীষণ দস্যুকাণ্ড হইয়া গেল।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হয়েছে বিষম কাণ্ড।
আহরিতে দুগ্ধ হায়রে হায়,
ভেঙে গেল বুঝি ভাণ্ড ॥

যেদিন রাধানগরের পথে পূর্ব্বকথিত দস্যুকাণ্ড হইয়া গেল— সেদিন শেষরাত্রে ব্রহ্মময়ী নিজ কক্ষে সুগভীর নিদ্রায় নিদ্রিত ছিলেন—সহসা কক্ষের কবাটে ঝম্ ঝম ধপ্ ধপ্ শব্দ হইল। সেই শব্দে তিনি চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলেন এবং গভীর রাত্রে কি ব্যাপার—বাড়ীতে ডাকাত পড়িযাছে নাকি—ভাবিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। উঠিয়া দরজা খুলিতে অথবা মুখ ফুটাইয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইতেছিল না। আবার শিকল নাড়ার ঝম্ ঝম্ শব্দ এবং কবাটে সজোরে করাঘাতের ধপ্ ধপ্ শব্দ উত্থিত হইল—সঙ্গে সঙ্গে বামার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—"মা মা, শীগ্গির উঠুন, ভয়ানক ব্যাপার।

বামার কণ্ঠ চিনিতে পারিয়া কর্ত্রীর উঠিতে সাহস হইল এবং নিতান্ত উদ্বিগ্ন ভাবে আসিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। তৎক্ষণাৎ বামা ও তৎপশ্চাৎ মনোমোহন অতি ব্যস্তভাবে কক্ষে প্রবেশ করিল। মনোমোহনের চেহারা দেখিয়াই ব্রহ্মময়ীর প্রাণ ভয়ে শুকাইয়া গেল—বুঝিলেন—কি যেন একটা বিষম কাণ্ড ঘটিয়াছে। ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

মনোমোহন একেবারে কর্ত্রীর পায়ের কাছে পড়িয়া নিতান্ত

ভীত ত্রস্ত স্বরে বলিল—"কর্ত্রী, কর্ত্রী, সর্ব্বনাশ হয়েছে, সর্ব্বনাশ হয়েছে! কি করতে কি করে ফেলেছি। কি হবে, কি হবে! হায়, হায়, কা'ল যখন পুলিশ খবর পাবে তখন কি উপায় হবে! রক্ষা কর কর্ত্রী, রক্ষা কর। হায়, হায়, একেবারে ধনে প্রাণে মারা গেলাম, ধনে প্রাণে মারা গেলাম।

ব্রহ্মময়ী কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আরও ভীত হইলেন; ব্যস্তভাবে সংক্ষুব্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—বল না খুলে, কি ঘটনা ঘটেছে?

"কর্ত্রী, তোমার জন্য এ করতে গিয়ে মরলাম—বল, বল, তুমি রক্ষা করবে কি না—তুমি রক্ষা না করলে আর উপায় নাই।"

কর্ত্রী অসহ্য হইয়া উঠিলেন—মনোমোহনের হাত ধরিয়া একটা ঝাঁকি দিয়া, তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—'আচ্ছা বেকুব নিয়ে পড়া গেল! আগে কি হয়েছে, তাই বল না, আহাম্মক, তারপর ত তার উপায়!

মনোমোহন তখন নিতান্ত ভীতভাবে বাষ্পাদ্রস্বরে রাত্রির ঘটনা বিবৃত করিল। সে যে সুনীতির সতীত্ব গৌরব ধ্বংস করার জন্য রমেশচন্দ্র হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে পথে লোক রাখিয়াছিল;—বেটারা যে এক করিতে আর করিয়া বসিয়াছে—মূর্খ বেটারা যে সুনীতিকে সহজে রমেশচন্দ্রের বক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইতে না পারিয়া সাংঘাতিক কাণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে,—তাহাদের যে গুরুতর প্রহারে অচেতন করিয়া সুনীতিকে লইয়া আসিয়াছে—তাহাদের প্রহারে যে রমেশচন্দ্র ও সুনীতি উভয়ই লুপ্তচেতন ও মরণাপন্ন—এই সব বিবরণ এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল।

ব্রহ্মময়ী শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার তখন কতক্ষণ পর্য্যন্ত কোন দিশা ও কথা বলিবার শক্তি রহিল না।

কিছুক্ষণ এইভাবে থাকিয়া তিনি চমকিত স্বরে ধীর কণ্ঠে বলিলেন—'এমনটা কেন করলে, মনোমোহন—এত দূর কেন গেলে ?

তিনি বুঝিয়া দেখিলেন—যখন ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তখন আর বর্ত্তমানে ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া কোনও লাভ হইবে না ; বরং তাহাতে আরও বিপদ ঘটিবে। যাহাতে এখন স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহাই করা উচিত। তাই ধীর কণ্ঠে বলিলেন—'এত দূর কেন গেলে ? এখন যে তুমিও মরতে বসেছ, আমিও মরতে বসেছি !

মনোমোহন কাঁপিতে লাগিল। তাহার মুখ দিয়া উত্তর বাহির হইল না।

কর্ত্রী বলিতে লাগিলেন—"যা করার তো করে বসেছ, এখন আর তা ভাববার সময় নাই। এখন কি করে' এই বিপদ হ'তে উদ্ধার পাওয়া যাবে, তাই চিন্তার বিষয়। একটা উপায় করতেই হবে—যত টাকা লাগে, লাগুক—টাকার কথা ভাবলে চলবে না !

তারপর বলিলেন—'যাক্ এখন সে কথা, এখন রমেশচন্দ্র ও সুনীতির কিরূপ অবস্থা, তারা কোথায় আছে, তাদের ছেলে দুটী কোথায়, তাই বল।

মনোমোহন কিছু শান্ত স্বরে বলিল—তাদের সকলকে আনিয়ে গোপনে এক বাড়ীতে রেখেছি—সেখানে দুটী লোক পাহারা আছে। রমেশচন্দ্র ও সুনীতি এখনও উভয়েই অজ্ঞান। ছেলে

দুটী ভাল আছে—তবে বড় অস্থিরভাবে কাঁদছে; একজন লোক তাদের দেখছে।

ব্রহ্মময়ী কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—'যাক্, তবুও রক্ষা, রমেশচন্দ্র ও ছেলে দুটী যে পথে পড়ে রয় নাই, সেটা বুদ্ধির কাজই হয়েছে। আমি ভেবে ভয় পেয়েছিলাম—বুঝি আহাম্মক বেটারা উহাদের পথে ফেলেই একা সুনীতিকে নিয়ে এসেছে।

মনোমোহন সংক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—'হাঁ, তারা তাইই করেছিল, ওদের কি অত বুদ্ধি আছে? আমি পরে তাদের সব আনিয়েছি।

"তা বেশ করেছ" বলিয়া কর্ত্রী কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার দুই চোখ ভরিয়া উঠিল। শত হইলেও তিনি রমণী। 'হায়, আমার জন্যই এই পবিত্র নিরপরাধ দম্পতি এত ক্লেশ পাইতেছে ও মরিতে বসিয়াছে" এইরূপ ভাবিয়া বোধ হয় তাহার প্রাণে ব্যথা বাজিল। তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হৃদয়ের বেগ উপশমিত করিতে পারিলেন না এবং এক রকম রুদ্ধশ্বাসে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর হায় রমেশ, আমিই তোমাকে বুঝি মারলাম' বলিয়া মর্ম্মতল হইতে এক গভীর শ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—

যাও,, মনোমোহন, এক্ষুনি যাও, এক্ষুনি তাদের সকলকে আমার বাড়ীতে নিয়ে এস—আমার দোষে যেমন তারা মরতে বসেছে, আমিই তাদের বাঁচাবো, তাদের জন্য প্রাণ দিয়ে খাটবো।

মনোমোহন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। তখন কর্ত্রী বামাকে ডাকিয়া বলিলেন—'যা বামা, তুইও ওর সঙ্গে

মা,—ছেলে দুটাকে খুব যত্নের সহিত নিয়ে আয়। ওদের ভার আমিই নেব।

মনোমোহনের সঙ্গে বামা কক্ষের বাহির হইতেই—আবার মনোমোহনকে কর্ত্রী ডাকিয়া বলিলেন—

'খুব সাবধান, খুব সাবধান—লোকের মুখ বন্ধ করতে যত টাকা লাগে, ব্যয় করবে। আমি টাকা মঞ্জুর করলাম। দেখবে—যেন কোন ক্রমেই প্রকাশ না পায়, এই দস্যু ব্যাপারের সাহি আমরা জড়িত আছি। খুব সাবধান।

'আজ্ঞা আচ্ছা', বলিয়া মনোমোহন চলিয়া গেল।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পতি পুত্র সেব সাধ
নারীর স্বভাব,
সুযোগে সকল নারী
পূরে সে অভাব॥

জমিদারিণী ব্রহ্মময়ীর বৃহৎ বাড়ী। তাহার মহালের দুই কক্ষে রমেশচন্দ্র ও সুনীতির চিকিৎসা চলিতেছে। কর্ত্রী অকুণ্ঠিত ভাবে টাকা ব্যয় করিতেছেন এবং সুনীতির পরিচর্য্যার ভার বামা ও মনোমোহনের উপর অর্পণ করিয়া নিজে রমেশচন্দ্রের সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন।

সুনীতি খুব বেশী আঘাত পায় নাই—সে দ্বিতীয় দিনেই সংজ্ঞা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু যখন চারিদিকে পাগলের মত চাহিয়া ও অনুসন্ধান করিয়া রমেশচন্দ্র ও ছেলে দুটীকে দেখিতে পাইল না, তখন হাহাকার করিয়া উঠিয়া আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর যত বারই চৈতন্য উদয় হয় তত বারই "হা স্বামী! হা পুত্র! কোথায় তোমরা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আবার সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে; মনোমোহন ও বামা পাশে বসিয়া তাহাকে এত বুঝায়, এত সান্ত্বনা দেয়—কিন্তু সুনীতির মন মানে না, তাহার বিশ্বাস জন্মে না। তাহার ধ্রুব ধারণা—ডাকাতেরা তাহার স্বামী ও পুত্রদ্বয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে, তাই তাহারা এখানে নাই। এই ভাবিয়া যে মুহূর্ত্তে জ্ঞান সঞ্চার হয়, সেই মুহূর্ত্তেই আবার পতি পুত্রশোকে জ্ঞান লোপ পায়। সে কিছু খায়ও না, দায়ও না—জ্ঞান ফিরিলেই কেবল আর্ত্তনাদ করে। এদিকে পাছে পতিপুত্রকে দেখিয়া পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে তাহাদের দেখানোও হয় না। কর্ত্রীর আরও কিছু অভিপ্রায় থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। অন্ততঃ ছেলে দুটীকেও সুনীতিকে একবার দেখাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও যে কেন তিনি করিতেছেন না, তিনিই জানেন।

রমেশচন্দ্রের উপর প্রহারটা কিছু অধিক হইয়াছিল—একটা আঘাত মাথায়ও পড়িয়াছিল। কাজেই তাঁহার সংজ্ঞালাভ করিতে প্রায় চারি পাঁচ দিন লাগিল। তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন হওয়ার পর হইতেই "কোথায় সুনীতি, কোথায় সুনীতি" বলিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মময়ী তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া মাথায় হাত বুলাইয়া তাঁহাকে নানাবিধ সান্ত্বনা দেন, বলেন—

ভাল আছে, ছেলেরা ভাল আছে, তাদের জন্য কোনও চিন্তা নাই, তুমি সুস্থ হয়ে উঠলেই তাদের দেখা পাবে।" কিন্তু রমেশের প্রাণ কিছুতেই শান্ত হয় না। কিছুতেই তাঁহার বিশ্বাস আসে না। 'একবার আমাকে দেখাও, একবার দেখাও' বলিয়া তিনি কাঁদিয়া আকুল হন।

দিন ছয়-সাত পর ডাক্তার রমেশচন্দ্র ও সুনীতি উভয়েরই শারীরিক ও মানসিক অবস্থা কথঞ্চিৎ ভাল দেখিয়া তাহাদের পরস্পরকে দেখাইতে উপদেশ দিলেন ও বলিলেন—"এখন দেখাইলেই ভাল, তাহাতে উভয়েরই মন আশ্বস্ত হবে ও আরোগ্য লাভ শীঘ্রতর হবে।

কিন্তু কর্ত্রী তাহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন,—বলিলেন — থাকনা আরও কিছুদিন? এখনই উভয়ের সাক্ষাতের এমন কি প্রয়োজন?

কর্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কহিবে কে? তাহার ইচ্ছামতই কাজ হইতে লাগিল।

রমেশচন্দ্রকে ব্রহ্মময়ী প্রাণ ঢালিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন। তিনি যে এত বড় ধনী রমণী, তাঁর যে এত ঐশ্বর্য্য, দাসদাসী— তাহা যেন সব ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যে এত আহারে বিহারে সখ ও বিলাসিতা ছিল, সব ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি আহার নিদ্রা তুচ্ছ করিয়া এক প্রাণে এক মনে রমেশচন্দ্রকে সেবা করিতেছেন—যেন ইহাতে তাঁহার কত আনন্দ, কত বুকভরা সুখ —যেন কতদিনের পুঞ্জীভূত আকিঞ্চনের সফলতা। ব্রহ্মময়ী বর্ত্তমান অবস্থাতে বড়ই সুখে আছেন—এ রকম সুখ তিনি যেন জীবনে আর কখনও পান নাই।

স্বামীসেবা ও পুত্র লালন পালন করার সুখের চেয়ে বড় সুখ বুঝি রমণীর নাই। তাই যে রমণীর জীবনে তাহার সুযোগ ঘটে না, তাহার জীবন বোধ হয় সম্পূর্ণ বিফলে যায়। সে রমণী বোধ হয়, রাজরাজ্যেশ্বরী হইয়াও পতি পুত্রবতী কুটিরবাসিনী দিন-ভিখারিণী অপেক্ষাও দুঃখিনী, দুর্ভাগ্যবতী।

ব্রহ্মময়ীর জীবনের সেই রমণী-সুলভ আকাঙ্খা আজ রমেশ-চন্দ্রকে সেবা করিয়া ও তাঁহার পুত্র দুইটিকে লালনপালন করিয়া যেন পূর্ণ হইতেছে—তিনি ভাগ্য-দোষে অকালে পতি হারাইয়া পতি পুত্র সুখে বঞ্চিত হইয়া যে অভাবের তাড়নায় হাবুডুবু খাইতেছিলেন, আজ যেন তিনি সেই অভাবের পূরণ করিয়া লইতেছেন।

তাই এই অবস্থার পাছে পরিবর্ত্তন ঘটে—পাছে এই সুখে বঞ্চিত হন, এই ভয়ে ডাক্তারের পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া কিছুতেই তাহাদিগকে পতিপত্নী পুত্রে মিলিত হইতে দিতেছেন না। তিনি নিজের সুখের জন্য তাহাদের সুখ শান্তি আশা বলি দিতে প্রস্তুত হইলেন।

আজ পঞ্চদশ দিবসে রমেশচন্দ্র অনেক পরিমাণে সুস্থ বোধ করিতেছেন—প্রভাত হইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কর্ত্রীর সহিত সুনীতি ও ছেলেদের সম্বন্ধে নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ ও আলাপ করিতে করিতে কিছু বেলা হইলে রুটি দুগ্ধ আহার করিয়া কিছু অবসাদ বোধে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ব্রহ্মময়ী ছেলেদুটাকে স্নানাহার করাইয়া, ঘুম পাড়াইয়া ধীরে ধীরে একখানা পাখা হাতে রমেশচন্দ্রের শিয়রে আসিয়া বসিলেন। ব্রহ্মময়ী নিঃশব্দে পাখা করিতে করিতে নির্নিমেষ নয়নে রমেশচন্দ্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন।' কি সুন্দর, কি প্রাণ-মনহারী! যদিও রমেশচন্দ্র এক্ষণে রোগে কিছু শীর্ণ ও মলিন হইয়াছেন, তবুও তাঁহার অবয়বের কমণীয়তা ও সৌন্দর্য্য একেবারে লুপ্ত হয় নাই। বিশেষ প্রেমমুগ্ধা রমণীর চৌক্ষে প্রিয়ের সৌন্দর্য্য হ্রাস পায় না। ব্রহ্মময়ী চাহিতে চাহিতে বিহ্বল হইলেন। হঠাৎ নিদ্রিত রমেশচন্দ্রের ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, এবং 'সুনীতি, সুনীতি'—দুইবার নামটি মুখ হইতে নিসৃত হইল। বোধ হয়—তিনি কোনও স্বপ্ন দেখিতেছিলেন।

এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রহ্মময়ীর হৃদয় গলিয়া গেল, চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'কি প্রেমিক, কি প্রণয়ী! এইরূপ প্রেমিককে একবার বুকে ধরিতে পারিলেও প্রাণের সকল জ্বালা নির্ব্বাপিত হয়।

ভাবিতে ভাবিতে তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—রমেশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—তিনি নিজেকে সামলাইতে পারিলেন না, প্রেমাবেশে মুখ নত করিয়া অধরে রমেশচন্দ্রের কপাল স্পর্শ করিলেন। অমনি রমেশচন্দ্র জাগিয়া, বিরক্ত ভাবে উঠিয়া বসিয়া রোষদীপ্ত নয়নে বলিতে লাগিলেন—ছিঃ ছিঃ কর্ত্রী, এ কি আপনার ব্যবহার। ছি, ছি আপনি আমার মাতৃতুল্য, আর আপনি আমার প্রতি—" আর বলিতে পারিলেন না, দুর্ব্বলতা ও উত্তেজনা বশতঃ কাঁপিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মময়ী তাহাতে বিচলিত বা লজ্জিত হইলেন না। ধীর অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—রমেশ, জানি আমি তোমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, কিন্তু প্রণয় বয়সের প্রভেদ মানে না। তুমি জান—তোমাকে দেখা অবধি আমি পাগল হয়েছি। কেন

হয়েছি ভগবান্ জানেন। আমার কিছুরই অভাব ছিল না ও নাই, কিন্তু তবুও তোমাকে আমি ভুলতে পারছি না। তোমার জন্য আমি পুড়ে যাচ্ছি। রমেশ, রমেশ, একবার কি এ অভাগিনীর প্রতি প্রসন্ন নয়নে চাবে না? সুনীতি তোমার থাক্, তার সুখ ভাঙতে চাইনা—তবুও কি তুমি আমার হবে না?" বলিতে বলিতে রমেশচন্দ্রের পা ধরিতে উদ্যত হইলেন।

"দূর হও, দূর হও, কি! কি! আমি সুনীতির প্রতি বিশ্বাস-ঘাতক হব,—তাহার নির্ম্মল স্বর্গীয় প্রেম পদদলিত করে তাকে অপমানিত ও ব্যথিত করবো,—দেবীর স্থানে দানবীকে বসাবো!! দূর হ, দূর হ, আমার সম্মুখ হ'তে! রমেশচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া উচ্চস্বরে এইরূপ গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বেগে যেন লাথি মারিতে পা তুলিলেন।

ব্রহ্মময়ী ক্ষিপ্র গতিতে পালঙ্ক ছাড়িয়া মেঝেতে দাঁড়াইলেন এবং কম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"তোমার লাথি আমি বুক পেতে নিতে পারি, তাতে আমার কোনও লজ্জা কি অপমান নাই। কিন্তু রমেশ, তোমাকে আমার চাইই! আমি জীবনে অনেক পাপ করেছি, পাপের জন্য আমি ভীত নই—যেরূপে পারি আমি তোমাকে আমার করবই—আমি আর কিছুই চাই না—আমার অন্য সব সাধই অনেক দিন হয় মিটেছে, কিন্তু আমার প্রেম পিপাসা অতৃপ্ত রয়েছে—একবার, শুধু একবার তোমায় বুকে চেপে সে পিপাসা মিটাতে চাই—তা মিটাবই। যতক্ষণ তা না হয়, তুমি তোমার সুনীতিকে পাবে না, ছেলেদেরও পাবে না। তারা এখন সম্পূর্ণ আমার অধিকারে আছে, আমার

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হ'লে, আমার হৃদয়ের আগুন না নিভলে, তাদের সর্ব্বনাশ করতেও পশ্চাৎপদ হব না। এখন বুঝে দেখ!

বলিয়া কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। রমেশচন্দ্র নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

আমার এসেছে সুখরাত্রি
তোরা সরে যা সরে যা
পথ হ'তে মোর,
ওরে ভিন্ন পথযাত্রী।

ব্রহ্মময়ী রমেশচন্দ্রের কক্ষ হইতে ববাবর আপন কক্ষে যাইয়া নিজের উত্তেজনায় নিজেই কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যার উপর মুখ গুজিয়া শুইয়া পড়িলেন এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারায় উপাধান ভাসাইতে লাগিলেন।

অন্য কক্ষে যখন রমেশচন্দ্রেব স্তম্ভিত ভাব ভাঙ্গিল, তখন তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। "হায়, তবে কি আমার সুনীতিকে আমি পাব না—আমার ছেলেদের আমি দেখতে পাব না। তাদের সর্ব্বনাশ করবে! কি! কি! দানবী আমার স্বর্গের পারিজাত তুল্য পবিত্র সুনীতির সর্ব্বনাশ সাধন করবে! আমার প্রাণের সুনীতি তার অমূল্য রত্ন হারাবে! তবে তো সে বাঁচবে না। হায়, হায় কি হবে! কি উপায় করি! কি ক'রে তাকে রক্ষা ক'র্বো! হা ভগবান্! আর তো সহ্য করতে পারছিনা- আমার ব্রহ্ম রন্ধ্র যে ফেটে যেতে চাচ্ছে—সমস্ত শরীরে যে আগুন জ্বলে গেল। না, না—আমি কখনই সুনীতিকে হারাতে পারবো না, কখনই তার সর্ব্বনাশ হতে দেব না। বা

হয়, আগার হউক, ডুবিতে হয়, আমি ডুবি—তবুও আমি আমার স্নীতিকে রক্ষা করবো—”

এইরূপ ভাবিয়া একেবারে ক্ষিপ্তের মত ছুটিয়া কর্ত্রীর কক্ষে যাইয়া প্রবেশ করিলেন এবং চীৎকার করিয়া, বিকৃত কণ্ঠে—ধর্ ধর্ পিশাচী, আমাকে বুকে ধর্, তোর সাধ পূর্ণ কর্—আমাকে ডুবা—তবুও আমার স্নীতির সর্ব্বনাশ করিস্ না—তাকে আমায় ফিরিয়ে দে”—বলিয়া উচ্ছন্ন উন্মাদের ন্যায় দুই বাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রহ্মময়ীও সবেগে শয্যা হইতে উঠিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন—এহই চাই. এত দিনে গর্ব্ব টুটলো!—কিন্তু এখন তো নয়—সন্ধ্যার পর যখন জ্যোৎস্নার তরঙ্গে সমগ্র জগৎ ভাসবে, তখন—তখন—তাইই আমার প্রাণ আলোড়ন করা তীব্র সাধ, গভীর আকাঙ্ক্ষা!

“তাইই হবে, তাইই হবে—তবুও আমি আমার স্নীতিকে চাই” বলিয়া যেমন পাগলের মত আসিয়াছিলেন সেইরূপ পাগলের মত বেগে রমেশচন্দ্র চলিয়া গেলেন।

রমেশচন্দ্র চলিয়া যাইতেই অন্য দ্বার দিয়া মনোমোহন কক্ষে প্রবেশ করিল এবং নিতান্ত ব্যাকুল কণ্ঠে বলিল—“না, কর্ত্রী, স্নীতিকে আর রাখা যাচ্ছে না—সে বুঝি পাগল হয়—সে যে একেবারে “স্বামী, স্বামী করে” অস্থির ও মতিচ্ছন্ন প্রায় হয়েছে। আমি আর তাকে আগলাতে পারি না—তুমি যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

ব্রহ্মময়ী হা হা করিয়া হাসিয়া বলিলেন—রোস, আর একটা

রাত্রি অপেক্ষা কর, তার পর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে, সব ব্যবস্থা করে দেব।

মনোমোহন গম্ভীর ভাবে যারপর নাই বিস্মিত হইল—কতক্ষণ অবাক হইয়া তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। তারপর বিস্ময়-চকিত স্বরে বলিল,—কথাটাতো ভাল বুঝলাম না। এ আবার কি ভাব?

আবার হা হা করিয়া হাসিয়া কর্ত্রী বলিলেন—'তা তুমি বুঝবে না, তুমি নির্ব্বোধ, অপদার্থ! যাক, আর তোমাকে দিয়ে আমার কোন দরকার নাই। আমি যার জন্ত তোমায় ধরেছিলাম, সে আমার হয়েছে—আজ সন্ধ্যার পর আমার সকল সাধ পূর্ণ হবে। তুমি চলে যাও—আমাকে আর বিরক্ত করো না,—এখন আমার সেই বাঞ্ছিত সুখের জন্য সজ্জা করতে হবে"—বলিয়া আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

'এ কি! এ পাগল হয়েছে নাকি।' এইরূপ মনে মনে ভাবিয়া বিস্ময়বিমূঢ়ভাবে মনোমোহন ব্রহ্মময়ীর প্রতি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ব্রহ্মময়ী আবার হাসিয়া একটু তীক্ষ্ণস্বরে বলিলেন—"দেখছো কি, ভাবছো কি? রমেশের জন্যই সব—তাকে ধরবার জন্যই সব—রমেশকে পেয়েছি—তুমি এখন দূর হও।

"ওঃ, তাই নাকি? এতদিনে বুঝলাম, রমেশচন্দ্রের প্রতি প্রেমই এই সব কারখানার মূল। আমি শুধু তাকে ধরবার জন্ত যন্ত্রস্বরূপ ছিলাম! এতদিনে রহস্ত বুঝলেম।"

বলিয়া মনোমোহন কালিমুখে আশাহত প্রাণে বাহির হইয়া গেল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"বিবর্ত্ত ত্যাগের চক্রে
জীবন ঘুরিয়া গেল,
পাপের প্রকট মূর্ত্তি
স্বর্গের আলোক পেল॥

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে—জ্যোৎস্নায় জগৎ ভরিয়া গিয়াছে প্রৌঢ়া ব্রহ্মময়ী আজ ষোড়শী যুবতীর ন্যায় সাজ সজ্জায় ভূষিতা হইয়া বাসকশয্যা সাজাইয়া প্রিয়ের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। তিনিও যেন আজ ঠিক প্রকৃতিস্থ নাই। তিনি কেন যে কি করিতেছেন, কিসের জন্য, কোন সুখের জন্য এমন সাজে সাজিয়াছেন—তাহাও যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। তিনি বসিয়া বসিয়া একবার কি ভাবিতেছেন, আবার কক্ষে লম্বিত বৃহৎ মুকুরে নিজের সাজসজ্জার প্রতি চাহিয়া আপন মনে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিতেছেন। তাঁহার যেন মনে হইতেছে—আর কিছু হৌক, না হৌক, রমেশচন্দ্রের গর্ব্ব ত' ভাঙ্গিলাম, তাহার নির্ম্মলত্ব ত' নাশ করিলাম—ইহাতেই আমার জয়, আমার তৃপ্তি,— এইরূপ ভাবিয়া জয়োল্লাসে মাতিয়া উঠিতেছেন—আবার যেন কি ভাবিয়া ম্লান হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ নানাভাবের তরঙ্গে ডুবিতেছেন ভাসিতেছেন—এমন সময় কাহার চঞ্চলপদশব্দ শুনা গেল। দেখিতে দেখিতে শ্মশানবাসী ভোলানাথের মত প্রমত্ত পাগল প্রায় এলোথেলো কেশবাসে রমেশচন্দ্র হাহারোল

করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও বিকৃতস্বরে বলিতে লাগিলেন—

নে পিশাচী নে, তোর সাধ পূর্ণ কর্ তোর তৃপ্তির জন্য, তোর পাপ বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য আমি আপনাকে বলি দিতে এসেছি—নে, নে আমায় বুকে ধর্, আমার রক্ত শোষ, নে।— তারপর নরকের অতলতলে নিক্ষেপ করে' দে—নে, নে—আমি তার জন্য কিছুই দুঃখ করি না—তবুও আমার সুনীতি রক্ষা পাক্, তার অমূল্য রত্ন তার থাক—

এইরূপ বলিয়া ব্রহ্মময়ীর বক্ষের উপর ঝাঁপ দিয়া পড়িতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু চকিতে ব্রহ্মময়ী উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন।

রমেশচন্দ্রের এই ভাব দেখিয়া, তাঁহার চোখের তেজে, মুখের জ্যোতিতে ও কণ্ঠের তীব্রতায় ব্রহ্মময়ী যেন কেমন হইয়া গেলেন, তাঁহার যেন কেমন এক ভাববিহ্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইল;—মুহূর্ত্তে যেন তাঁহার জীবন-ধারা, মনের গতি বদলাইয়া গেল—তিনি সমস্ত সাধ আকাঙ্খা ভুলিয়া গিয়া ভাবিতে লাগিলেন—"ইনি কি মানব, না, দেবতা! যিনি নির্ম্মল প্রেমের গৌরব ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, আপনাকে বলি দিতে প্রস্তুত হন্, তিনি কি সামান্য মানুষ! না, না, তিনি অনেক উচ্চে—তিনি সাধারণ মানব হইতে অনেক অধিক গরীয়ান্, মহীয়ান্। আমি ক্ষুদ্র মানবী, কলুষিতা মানবী কি তাঁর যোগ্য—তাঁকে স্পর্শ করিবার উপযুক্ত! না না—এমন দেবতাকে আমি স্পর্শ করিতে পারি না—কখনই পারি না;

ও, কি! দাঁড়ায়ে রইলে কেন? ধর, ধর, তোমার সাধ

পর্শ কর—আমার যে আর সহ্য হচ্ছে না—কোথায় আমার সুনীতি ?—দাও, দাও আমার সুনীতিকে দাও !

বলিয়া উন্মাদের ন্যায় ঝম্প দিয়া রমেশচন্দ্র ব্রহ্মময়ীর গায়ের উপর পড়িলেন। অমনি ব্রহ্মময়ী ভূমিতে লুটাইয়া রমেশচন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিলেন—"না, না, তোমার প্রেম স্বর্গের নিধি, তার যোগ্য আমি নই। তোমার প্রেম আমার উপভোগের নয়,—আমার পূজার,—তুমি দেবতা—"

এমন সময় "কোথায় পিশাচী, কোথায় রাক্ষসী, আমার স্বামীকে দে—আমার স্বামী তুই গ্রাস করবি, আমার বক্ষ হ'তে আমার সর্ব্বস্বকে ছিনিয়ে নিবি—এত বড় তোর ক্ষমতা, এত বড় তোর স্পর্দ্ধা...

বলিতে বলিতে ঘোর উন্মাদিনীর ন্যায়—শার্দ্দূলী প্রায় জ্বলন্ত চক্ষু খাড়া করিয়া সুনীতি দ্রুতবেগে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রণরঙ্গিণী ভাবে দাঁড়াইলেন ও তাঁহার দৃষ্টিতে অগ্নি ছুটিতে লাগিল। ব্রহ্মময়ী সন্ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া ভয় ভক্তি মিশ্রিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"না, না, সুনীতি, তোমার স্বামীকে কি আমি নিতে পারি ? আমার কি তত শক্তি বা স্পর্দ্ধা আছে ? তোমার স্বামীর তুমিই উপযুক্ত—তোমরা দেবতা, তোমাদের প্রেম তোমাদেরই উপভোগ্য। আমি কি দেবতা স্পর্শ করতে পারি ? আমি যে পাপিনী, কলুষিতা রমণী, নরকের অতি জঘন্য কীট ! নেও, সুনীতি, নেও —তোমার সর্ব্বস্ব তুমিই নেও !

ইতিমধ্যে রমেশচন্দ্র সুনীতিকে সম্মুখে পাইয়া একেবারে পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ

করিয়াছেন এবং মাথার উপরে মাথা রাখিয়া অজস্র অশ্রুধারায় হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ উচ্ছ্বাসে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুনীতিও স্বামীর বক্ষে মিশিয়া গিয়া অশ্রুর প্লাবনে ভাসিয়া যাইতেছেন।

এই সময় মনোমোহন ভীতভাবে ছুটিতে ছুটিতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে—"কোথায় বৌদিদি, কোথায় বৌদিদি—হায় হায়, কেন আমি তখন বলে দিয়েছিলাম, কেন পরিণাম না বুঝে, মনের খেদে সব প্রকাশ করেছিলেম—হায়, হায়, বৌদিদি বুঝি উন্মাদিনী হয়ে কি বিষমকাণ্ড করে' বসে!" বলিতে বলিতে তথায় আসিয়া এই চিত্র দেখিয়া একেবারে অবাক স্তম্ভিত হইয়া গেল। সেই সময় বামাও ছেলে দুটাকে বক্ষে জড়াইয়া ব্যস্তভাবে তথায় আসিল। সে ছেলে দুটীকে কোলে লইয়া বসিয়াছিল—এমন সময় কর্ত্রীর কক্ষে সোরগোল শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। ছেলে দুটীও ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। কাহারও কাছে রাখিয়া আসিতে লোকও দেখিল না। তাই তাহাদের বক্ষে ধরিয়া ছুটিয়া আসিল।

কর্ত্রী তখন সেই দম্পতির প্রতি বহুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিয়া, যুক্তকরে অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"যা হবার হয়েছে। বিধাতা বুঝি আমার ভালর জন্যই এই সব ঘটালেন। যাক্, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে অনেক পাপ করেছি—বোধ হয়, সর্ব্বাপেক্ষা তোমাদের ন্যায় স্বর্গীয় পবিত্র দম্পতিকে যে অকারণ এত ক্লেশ যন্ত্রণা দিয়েছি, সেই পাপটাই বড় হয়েছে;—বুঝেছি, আমার তুল্য পাপিনী আর ত্রিজগতে নাই—আমার স্থান নরকেও হবে না—তবুও একবার প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করবো;—যে ঐশ্বর্য্যের গর্ব্বে আমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম, সেই ঐশ্বর্য্য আর

না—সংসার ত্যাগ করে কাশী বাসী হব। তাই তোমাদের কাছে একটা ভিক্ষা চাই। তোমরা নিশ্চয়ই বোধ হয় আমায় ক্ষমা করতে পারবে না—আমি তা চাইও না, কারণ এত বড় উচ্চ আশা করতে আমি সাহস পাইনা—তবে আমাকে একটা ভিক্ষা দিতেই হবে—যাতে আমি আমার জীবনের অনন্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার চেষ্টা করতে পারি; সেই জন্য এইটুকু তোমাদের করতেই হবে।—আমার প্রার্থনা আমাকে এটি দাও।”

এই বলিয়া কর্ত্রী ছোট ছেলেটিকে দুই হাতে জড়াইয়া লইয়া তাঁহাদের সম্মুখে অঞ্জলি বদ্ধ ভাবে নত জানু হইয়া বসিয়া তাঁহাদের প্রতি নিতান্ত ব্যাকুল প্রার্থনা-পূর্ণ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাহার দুই গণ্ড বাহিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু গড়াইতে লাগিল।

সে দৃশ্য এমনই করুণ, এমনই হৃদয় দ্রাবক হইয়া ফুটিয়া উঠিল যে সেখানে তখন যাহারাই ছিল, সকলেরই চোখ ভরিয়া দর দর ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

সুনীতি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—এক বার রমেশ-চন্দ্রের কোমল করুণা মাখা দৃষ্টির প্রতি চাহিয়া আবেগভরে আসিয়া কর্ত্রীকে বাহু ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন—

“কর্ত্রী, যথেষ্ট হয়েছে! সকলই ভগবানের চক্রে হয়ে থাকে, মানুষ কি করতে পারে? যাক্, আপনার এত অনুতাপ, এত আত্ম গ্লানির পর আর কি আমার আপনাকে ক্ষমা না ক’রে থাকতে পারি? আপনার প্রতি আমাদের আর একটুও রাগ বা ক্ষোভ নাই।”

এই বলিয়া ছোট ছেলেটিকে একবার কোলে লইয়া, আবেগ ভরে মুখ চুম্বন করিয়া—ব্রহ্মময়ীর হস্তে অর্পণ করিলেন এবং

বড় ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইলেন।

রমেশচন্দ্রও প্রসন্ন বদনে বড় ছেলের মাথায় হস্ত করিয়া ভক্তি ভরা নেত্রে উর্দ্ধপানে চাহিলেন—বুঝি, সর্ব্ব অমঙ্গল অবসানে এই শুভ অবস্থা পরিবর্ত্তনে ও সৌভাগ্য উদয়ের জন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় পরম পিতাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ধন্যবাদ দিলেন।

বোধ হয় খাটি বিশুদ্ধ চরিত্রের পুরস্কার পরিণামে ভগবান্ এইরূপেই দিয়া থাকেন।

সমাপ্ত